সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ২৭-২৮
বার : সোমবার

০৩ এপ্রিল- ২০২৩ ঈসায়ী
২০ চৈত্র- ১৪২৯ বাংলা
১১ রামাযান- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল-কুরআনুল হাকীম**
  - ❖ **যাকাত ও তার বন্টননীতি**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **রামাযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ **লাইলাতুল ক্বদ্‌র বা শবে ক্বদ্‌র কোন রাতটি?**
    মাকসুদুর রহমান- ১৩
- **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **আল্লামাতুশ শাম শাইখ মুহাম্মদ বাহজাহ আল বায়তার (রাহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম**
    অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক- ১৯
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - ❖ **১৭ই রামাযান : মহান আল্লাহর রহমতে সিক্ত বদরের ময়দান**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২২
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৫
- **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **পহেলা বৈশাখ : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি**
    আবু লাবীবা- ২৭
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা নৈতিকতার অবক্ষয়**
    মো. আরিফুর রহমান- ৩১
- **মহিলাজগৎ :**
  - ❖ **“মা” পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজনই**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩৩
- **কবিতা** ৩৬
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৭
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৩৮
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৩

সম্পাদকীয়

উদাস মনে খুঁজি যারে

মৌসুমি ফসল আমের মুকুল গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে। সময় গড়িয়ে পাকতে শুরু করবে। তখন হবে আমের ভরা মৌসুম। রসালো পাকা আম সবার চোখ জুড়াবে। মিষ্টি আমের স্বাদ কতইনা মধুর। রামাযান অনুরূপ অবারিত কল্যাণের মৌসুম। বছর ঘুরে আসে একবার। প্রথম রাত্রি যেন মুকুলভরা পুণ্যময় বাগান। সময় গড়িয়ে পূর্ণতার দিকে যাবে রামাযান। কল্যাণের সমারোহ ঘটবে তাতে। তাই কল্যাণকামীরা ধীরে ধীরে এগুতে থাকবে পুণ্যের ভরা মৌসুমে। ধন্য তারাই হবে, যারা রামাযান পাবে, সিয়াম পালন করবে, ক্বিয়ামুল লাইল করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, দান-সাদাক্বাহ্ করবে, অনাথ-অসহায় মানুষের মুখে অন্ন যোগাবে। একজন সায়েমকে ইফতার করাবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, শেষ দশকে রাত্রি জাগরণ করবে, ক্বদরের রাত তালাশ করবে এবং যাকাতুল ফিত্র আদায় করে ঈদের জামা'আতে শরীক হবে। সেদিন হবে তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত আকাশ-বাতাস। মহান আল্লাহর অনুকম্পায় ধন্য হয়ে মুসলিম জাহানে শান্তির সমীরণ বইবে অনায়াসে। স্বার্থক হবে মুসলিমের জীবন। পুরো পরিবার মহান আল্লাহর মাগফিরাত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হয়ে ওঠবে ব্যাকুল। এটাইতো মুসলিমদের ঈদ। যাতে 'ইবাদত মুখ্য, আনন্দ-উল্লাস গৌণ। কোনো কারাবন্দি কারামুক্তির পরই তার আসল আনন্দ; ঠিক তেমনি জাহান্নাম হতে মুক্তি ঘোষণা যে রামাযান এনে দেবে, সেটিই হবে প্রকৃত আনন্দ।

বারো মাসে বছর। কিন্তু কেবল রামাযান মাসের নামই আল-কুরআনে এসেছে। আবার এর মাঝে ক্বদরের রাত মহিমান্বিত। সে রাতের নামে নাযিল হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা 'সূরাতুল ক্বদর'। মানব সভ্যতার সূচনা হতে সিয়াম ফর্য করেছেন আল্লাহ তা'আলা। আমাদেরকে একটি মাস তথা রামাযানে সিয়াম ফর্য করেছেন। এ মাসেই নাযিল করেছেন মানবতার মুক্তির সনদ আল-কুরআন। যারা রামাযানে সিয়াম পালন করবে এবং রাতে ক্বিয়ামুল লাইল-এর মাধ্যমে কুরআন পঠন-পাঠনে মশগুল থাকবে, তাদের জন্য সিয়াম ও কুরআন সুপারিশ করবে। আর দয়াময় আল্লাহ এ দু'য়ের সুপারিশ ক্ববুল করবেন। সৌভাগ্যবান তারাই, যারা রামাযান পেয়েছেন, ক্বিয়াম করেছেন এবং ক্বদরের রাত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা এ পুণ্যময় মাস পেয়েও জান্নাতের অধিবাসী হতে পারলো না, তাদের মতো হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় সে চিরবঞ্চিত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সাহাবীগণ রামাযানের শুরু যেভাবে করতেন, শেষটা আরো সমৃদ্ধ করতে প্রাণান্ত কোশেশ চালিয়ে যেতেন। মা আয়েশা (রা.) বলেন, রামাযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইবাদতে যে পরিমাণ মেহনত করতেন, অন্য কোনো সময়ে সেরূপ মেহনত করতেন না। কিন্তু পরিতাপ এই যে, প্রিয় নবীর (ﷺ) অনুসারী দাবিদার বর্তমান মুসলিম তাঁর পুরো উল্টো। রামাযানের প্রথম দিকে 'ইবাদতে কিছুটা ব্যস্ত দেখা গেলেও শেষের দিকে যখন ফল পাকতে শুরু করে তথা রামাযান পূর্ণতার দিকে যায়, তখন আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিম মসজিদ ছেড়ে বাজার মুখী হয়ে যায়। শপিং মলগুলোতে নারী-পুরুষের ভীড়। এ সবই আমাদের উদাসীনতার পরিচয় বহন করে। প্রকৃত কল্যাণকামী মুসলিম কি তা মেনে নিতে পারে? সালাফগণ রামাযান ফুরিয়ে আসলে উদাস মনে ব্যাকুল হয়ে যেতেন। আর আমরা গাফলতির চরম সীমা অতিক্রম করে দৈন্যতার পরিচয় দিচ্ছি।

সাপ্তাহিক আরাফাত আমাদের জাতীয় সম্পদ। এটি "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর একমাত্র মুখপত্র, যা ১৯৫৭ সাল হতে এ যাবত আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর। অতিক্রম করছে ৬৪তম বছর। পবিত্র এ রামাযানে আপনি-আমি এ আরাফাত পত্রিকার জন্য কী করেছি, তা একটু ভাবা দরকার। আসুন! এ পত্রিকার পাঠক হই, পাঠক বাড়াই, গ্রাহক সৃষ্টি করি। ছড়িয়ে দেই দেশের সর্বত্র– এ হোক আমাদের এবারের স্লোগান। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আমিন ❑

আল কুরআনুল হাকীম

যাকাত ও তার বন্টননীতি

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

ভূমিকা

যাকাত হলো ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমের যত জায়গায় সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন তত জায়গায় তিনি সালাতের সাথে যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

"আর তোমরা সালাত আদায় করো ও যাকাত প্রদান করো। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো কাজের মধ্যে থেকে যা প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয় তিনি দেখছেন তোমরা যা কিছু করছ।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

وَ -ও/এবং/আর, اَقِيْمُوْا -তোমরা কায়েম করো, الصَّلٰوةَ -সালাত/নামায, وَ -ও/এবং/আর, اٰتُوْا - তোমরা প্রদান করো, الزَّكٰوةَ -যাকাত وَ - ও/এবং/আর, مَا -যা, تُقَدِّمُوْا -তোমরা আগে পাঠিয়েছ, لِاَنْفُسِكُمْ -নিজেদের জন্য, مِّنْ - হতে/থেকে, خَيْرٍ -ভালো/উত্তম, تَجِدُوْ -তোমরা পাবে, هُ -তাকে, عِنْدَ -নিকটে, اللّٰهِ -আল্লাহর, اِنَّ - নিশ্চয়, اللّٰهَ -আল্লাহ, بِمَا -যা, تَعْمَلُوْنَ -তোমরা করো, بَصِيْرٌ -প্রত্যক্ষদর্শী।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এরকম বর্ণনা রীতি থেকে বুঝা যায়, স্বলাত ও যাকাত একটি আরেকটির পরিপূরক। কোনো ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করে যাকাত প্রদান না করে, তার সালাত যেমন হবে না, অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যদি যাকাত প্রদান করে কিন্তু স্বলাত আদায় না করে, তার সে যাকাত প্রদানও তার কোনো কাজে আসবে না।

زكاة-এর সংজ্ঞা

زكاة আরবী শব্দ। **অর্থ-** পরিশুদ্ধকরণ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿خُذْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِم بِهَا﴾

অর্থ– (হে নবী!) তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর তা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"[২]

যাকাত সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে। তাই যাকাতকে যাকাত বলা হয়। ইসলামী শরিয়তে যাকাত বলা হয়– ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফর্যকৃত অংশকে। ব্যবহারিক অর্থে– যে কোনো প্রকারের বহন বা স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণে পূর্ণ একবছর থাকলে তার মধ্য থেকে দেয়া সম্পদকে যাকাত বলে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাত হলো– বিত্তশালীদের (সাহাবে নিসাবের) ওপর আরোপিত এক ধরনের সুনির্দিষ্ট কর। এক কথায়– প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যদি তা ইসলামী শরিয়তের নির্ধারিত সীমা (নেসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে দুঃস্থ-অসহায়দের মাঝে একটি নির্দিষ্ট অংশ বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলে।

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১১০।*

[২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৩।*

৪৬;-এর নেসাব বা পরিমাণ

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা (দু'টি যদি কারো কাছে এমন ভাবে থাকে যে কোনোটিই আলাদাভাবে নেসাব পরিমাণ হয়নি তাহলে দু'টির সমষ্টি করে দেখতে হবে, তা কোনো একটির নেসাব পরিমাণ হয়েছে কি-না, হয়ে থাকলে যাকাত দিতে হবে), অথবা ব্যাবসায়িক পণ্য যদি এই দু'টির কোনো একটির সমপরিমাণ হয় এবং বাড়ি-ঘর-ফ্লাটের (যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাড়ি, ঘর বা ফ্লাট ক্রয় করা হয়ে থাকে) কিংবা কৃষিপণ্য ও চতুষ্পদ প্রাণি পূর্ণ একবছরের মালিকানায় থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৪৬; দানের পরিমাণ

মজুদ বা সঞ্চিত সম্পদের ১/৪০ অংশ বা ২.৫%।

কৃষিপণ্যের যাকাত : যে সকল শস্য জমিতে উৎপন্ন হয় তা যদি মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তা যদি ওজন ও গুদামজাত করা যায়, তাহলে সে সকল শস্যে যাকাত আদায় করা ফর্‌য (আবশ্যিক কর্তব্য)। শাক-সবজি ও কাঁচামাল যেহেতু গুদামজাত করা যায় না, সেহেতু তাতে যাকাত আবশ্যিক নয়। তবে কেউ যদি কাঁচা মালের ব্যবসা করে তাহলে কাঁচা মালের নয় সে তার ব্যবসার (লাভ-পুঁজির) যাকাত দিবে।

কৃষিপণ্যের যাকাতের পরিমাণ : কৃষিপণ্যের নেসাব বা পরিমাণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

অর্থাৎ- পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলে যাকাত নেই।[৩]

এক ওয়াসাক = ৬০ সা'। সুতরাং ৫ ওয়াসাক = ৬০ × ৫ = ৩০০ সা'। ১ সা' = ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ সা' = ৭৫০ কেজি, অর্থাৎ- ১৮ মন ৩০ কেজি। অতএব, এই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হলে তাতে যাকাত আদায় করতে হবে নচেৎ নয়।

[৩] *সহীহ্ বুখারী, অধ্যায়-যাকাত, হাদীস নং-১৪৮৪।*

কৃষিপণ্যের যাকাত আদায়ের পরিমাণ : বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ (যাকে আরবীতে ওশর বলা হয়) যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। আর কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল অথবা বর্ষার পানি ও কৃত্রিম সেচ (উভয়ের মধ্যে যদি বর্ষা-বৃষ্টির পানি কৃত্রিম পানির সমান বা বেশি হয়) তবে এর মাধ্যমে সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলে "নিসফে ওশর" বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর যদি (উভয়ের মধ্যে যদি বর্ষা-বৃষ্টির পানির তুলনায় কৃত্রিম পানি সমান বা বেশি হয়) তবে "ওশর" বা দশ ভাগের তিন-চতুর্থাংশ যাকাত হিসেবে প্রদান করবে। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

চতুষ্পদ প্রাণির যাকাত : চতুষ্পদ প্রাণির মধ্যে শুধু উট, গরু ও বকরির যাকাত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া সাধারণ কোনো পাখি, হাস-মুরগি, গাধা, ঘোড়া ও খরগোশ এদের যাকাত নেই। তবে যদি কেউ এগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে লালন-পালন করে তবে ব্যবসায়ের সম্পদ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। আর কেউ কেউ মহিষকে গরুর স্থলাভিষিক্ত করে তার যাকাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

চতুষ্পদ প্রাণির যাকাতের নেসাব ও যাকাত আদায়ের পরিমাণ :

১. উট– পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই। ৫টি থেকে ৯টি পর্যন্ত একটি বকরি। ১০টি থেকে ১৪টি দু'টি বকরি। ১৫টি থেকে ১৯টি তিনটি বকরি। ২০টি থেকে ২৪টি হলে চারটি বকরি (এ ক্ষেত্রে মালিক চারটি বকরির পরিবর্তে একটি উট প্রদান করতে পারবে।) এর পর ২৫টি থেকে ৩৫টি পর্যন্ত দু'বছরের উটনী। ৩৬টি থেকে ৪৫টি পর্যন্ত তিন বছরের উটনী। ৪৬টি থেকে ৬০টি পর্যন্ত একটি চার বছরের উটনী। ৬১টি থেকে ৭৫টি পর্যন্ত একটি পাঁচ বছরের উটনী। ৭৬টি থেকে ৯০টি পর্যন্ত দু'টি তিন বছরের উটনী। ৯১টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত দু'টি চার বছরের উটনী। এর বেশি হলে প্রতি ৪০টিতে একটি তিন বছরের উটনী ও প্রতি ৫০টিতে একটি চার বছরের উটনী, এই হিসেবে বৃদ্ধি পাবে।

২. গরু– এক থেকে ঊনত্রিশ পর্যন্ত গরুতে কোনো যাকাত নেই। ৩০টি থেকে ৩৯টি পর্যন্ত গরু থাকলে একটি এক বছরের বাছুর যাকাত হিসেবে দিতে হবে। ৪০টি থেকে ৫৯টি পর্যন্ত একটি দু'বছরের গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে। ৬০টি হলে দু'টি একবছরের বাছুর আর ৭০টি হলে একটি এক বছরের ও একটি দু'বছরের গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর ১০০টি হলে দু'টি এক বছরের ও একটি দু'বছরের গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

৩. বকরি ও মেষ– চল্লিশের কম মেষ-বকরিতে যাকাত নেই। ৪০টি থেকে ১২০টি পর্যন্ত একটি বকরি যাকাত হিসেবে দিতে হবে। ১২১টি থেকে ২০০টি পর্যন্ত দু'টি বকরি আর ২০১টি থেকে ৩০০টি পর্যন্ত তিনটি বকরি। তারপর প্রতি ১০০টিতে একটি করে বকরি যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

যাকাত প্রদানের খাতসমূহ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাকাত বন্টনের আটটি খাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় যাকাত হচ্ছে– (১) ফকীর ও (২) মিসকীনের জন্য এবং (৩) এতে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য। আর (৪) যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য। (৫) দাস আজাদ করার জন্য, (৬) ঋণগ্রস্তদের জন্য, (৭) ফী সাবিলিল্লাহ বা মহান আল্লাহর রাস্তায় এবং (৮) মুসাফিরের জন্য।"[৪]

যাকাত প্রদানের ফযীলত

যাকাত আদায়ে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়। এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাকাত হিসেবে যা প্রদান করো, আল্লাহ সেগুলো বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।"[৫]

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করে তার ব্যাপারে আপনার রায় কি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করেন, তার সম্পদে যত সমস্যা (ক্ষয়-ক্ষতি বা বিপদ) আছে তা দূর হয়ে যাবে।[৬]

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

কেউ যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে তার সম্পদ হলাল হবে না। তার সালাত কবুল হবে না। তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের বেদনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও! সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের কপালে পার্শ্বে ও পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। আর বলা হবে এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছ।"[৭]

খলিফা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীকে মুরতাদ বলে ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

মোটকথা

ঈমান, রোযা, নামায ও হজ্জের মতো যাকাত হলো একটি ফর্‌য 'ইবাদত। কোনো ব্যক্তির যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ একবছর তার মালিকানায় থাকে, তাহলে তাকে সেই সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় সে মহান আল্লাহর গযবের শিকার হবে। ❑

---

[৪] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০।*

[৫] *সূরা আর্ রূম : ৩৯।*

[৬] *আত্ তারগীব- ১ম খণ্ড, ৩৩৫ পৃ.।*

[৭] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৪ ও ৩৫।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

রামাযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهَا) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

বঙ্গানুবাদ

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।[৮]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

‘আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা। তাঁর মাতার নাম উম্মে রুম্মান। তিনি ৬১৩/১৪ খৃ. হিজরতের ৮/৯ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াতের দশম বছর হিজরতের তিন বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে মুহাম্মদ মোস্তাফা (ﷺ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬/৭ বছর। মহানবী (ﷺ) তাঁর এই প্রিয়তমা স্ত্রীকে আদর করে হুমাইরাহ্ বলে ডাকতেন। তিনি নবী (ﷺ)-কে নয়টি বছর জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নবী থেকে বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা প্রচারও করে গেছেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একজন বড়ো ফিকহবিদ সাহাবিয়া ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে যে ছয়জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন। তাঁর সনদে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

‘আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৫৭/৫৮ হি. সনে মতান্তরে ৬৫/৬৭ বছর বয়সে ১৭ রামাযান মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওসীয়ত মোতাবেক তাঁকে রাতের অন্ধকারে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইতিকাফের পরিচয় : ইতিকাফ اَلْعَكْفُ ধাতু হতে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি‘আল-এর মাসদার। **অর্থ–** নিজেকে কোনো স্থানে আবদ্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ‘ইবাদত ও তিলাওয়াতের মধ্যে আবদ্ধ রাখাকে ইতিকাফ বলা হয়।[৯] আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে ‘ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে, তাকে বলা হয় মু‘তাকিফ (معتكف) বা আকিফ (عاكف)।[১০]

ইতিকাফের প্রকারভেদ : ইতিকাফ দুই প্রকার। যথা- ১. ওয়াজিব ও ২. সুন্নাত।[১১]

১. ওয়াজিব : ওয়াজিব ইতিকাফ হলো– যা ইতিকাফকারী নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। যেমন- যদি কেউ কোনো ভালো কাজের উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করার মানত করে তাহলে তার মানত পূরণ করা আবশ্যক। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

اَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম (আমি কি তা পূরণ করব?) নবী করীম (ﷺ) বললেন, তোমার মানত পূরণ করো।[১২]

২. সুন্নাত : সুন্নাত ইতিকাফ হলো– যেটা রাসূল (ﷺ), তাঁর স্ত্রীগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম করেছেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

اَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيُّ (ﷺ) كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اِعْتَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه.

রাসূল (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন।[১৩]

ইতিকাফের উদ্দেশ্য :

১. রাসূলুল্লাহর (ﷺ)-এর ইতিকাফের মূল লক্ষ্য ছিল লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের খোঁজ করা; আর সেই রাতে ক্বিয়াম করা ও তা উজ্জীবিত করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া, আর তা হলো এই রাতের মহান ফযীলত এর কারণে। আর আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

---

[৮] *সহীহ মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হা. ২৬৫৩।*
[৯] *ফিক্বহুস্ সুন্নাহ- ১ম খণ্ড, কায়রো, মিশর : দারুল ফাতাহ, পৃ. ৫৩৯।*
[১০] *আল-মিসবাহুল মুনীর- ২/৪২৪; লিসানুল আরব- ৯/২৫২।*
[১১] *ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৫৪০ পৃ.।*
[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩২।*
[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭২।*

"লাইলাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাস থেকেও উত্তম।"[১৪]

২. এর (এই রাতের) সময়সীমা জানার ও খোঁজার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া। তিনি শুরু করেন প্রথম দশ দিনে, এরপর মাঝের দশ দিনে, এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে জানানো হয় যে, তা (লাইলাতুল ক্বাদ্‌র) শেষ দশকে। আর এ হলো লাইলাতুল ক্বাদরের খোঁজে এক সর্বাত্মক সাধনা।

৩. মানুষের থেকে যথাসম্ভব আলাদা হয়ে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্ল-এর সান্নিধ্যে একা হয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রতি সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করে আত্মশুদ্ধিকরণ।

৫. সালাত আদায়, দু'আ করা, যিক্‌র পাঠ, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে 'ইবাদত করার জন্য সম্পূর্ণভাবে লেগে যাওয়া।

৬. নাফসের কু-প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা যা সাওমের উপর প্রভাব ফেলে তা থেকে সাওমকে রক্ষা করা।

৭. দুনিয়াবী মুবাহ বিষয়সমূহ ভোগ কমিয়ে দেওয়া এবং তার অধিকাংশের ব্যাপারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভোগ করার ক্ষেত্রে যুহদ বা কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করা।

ইতিকাফের স্থান : মসজিদেই ইতিকাফ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না।"[১৫] রাসূল (ﷺ) মসজিদে ইতিকাফ করতেন। তদ্রূপ তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে ইতিকাফ করেছিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصْغِي إِلَيَّ رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় নবী করীম (ﷺ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।[১৬] যে কোনো মসজিদে ইতিকাফ করা জায়িয।[১৭] কেননা, আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে (فِي الْمَسَاجِدِ) 'মসজিদসমূহে'[১৮] উল্লেখ করেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, সালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ হবে না।[১৯]

ইতিকাফকারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহে প্রবেশ না করা : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَإِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) «لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ইতিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।"[২০]

ইতিকাফ অবস্থায় কী কী কাজ নিষিদ্ধ?

(১) স্বামী স্ত্রীর মিলন, স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করা, তবে প্রয়োজনে স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে যে কোনো সেবা গ্রহণ করতে পারে। **(২)** মসজিদ থেকে বের হওয়া। বেচাকেনা, চাষাবাদ, এমনকি রোগীর সেবা ও জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্যও মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নয়। বের হলে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। মসজিদে কোনো মাইয়্যেত হাজির হলে তার সালাত আদায়ে শরীক হওয়াতে কোনো দোষ নেই।

ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় কত?

ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমগণের মতে, ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। আর এটি ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আশ্ শাফি'য়ী ও ইমাম আহমাদের মত।[২১]

ইমাম আন-নববী বলেছেন, "আর ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা সম্পর্কে অধিকাংশ (আলেমগণ) যে মত তা'কীদের সাথে পোষণ করেন এবং এটিই সঠিক মত যে এর জন্য মসজিদে অবস্থান শর্ত (অর্থাৎ- ইতিকাফ মসজিদে হতে হবে) এবং তা বেশি বা অল্প সময়ের জন্য হতে পারে, কিছু সময় বা মুহূর্তের জন্যও।"[২২]

ইবনু হাযম বলেছেন : "ইতিকাফ আরবদের ভাষায়– অবস্থান করা। তাই আল্লাহ তা'আলার মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোনো অবস্থানই হলো ইতিকাফ ... সময়সীমা কম হোক বা বেশি হোক, যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি।"[২৩]

---

[১৪] *সূরা আল ক্বাদ্‌র : ৩।*
[১৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৭।*
[১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৭।*
[১৭] *সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- পৃ. ১৫১।*
[১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ :১৮৭।*
[১৯] *বায়হাক্বী- হা. ৮৩৫৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্র. মিরআত- হা. ২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৭।*
[২১] *আদ্ দুরর আল মুখতার- ১/৪৪৫; আল মাজমূ'- ৬/৪৮৯; আল ইনসাফ- ৭/৫৬৬।*
[২২] *আল মাজমূ- ৬/৫১৪।*
[২৩] *আল মুহাল্লা- ৫/১৭৯।*

ইবনু আবী শাইবাহ, ইয়ালা ইবনু উমাইইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : "আমি মসজিদে 'সা'আহ' বা কিছু সময় অবস্থান করি আর আমি ইতিকাফ করার জন্যই অবস্থান করি।"[২৪]

শাইখ ইবনু বায বলেছেন, ইতিকাফ হলো আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা, সময় কম হোক বা বেশি হোক। কারণ, আমার জানা মতে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা একদিন, দুই দিন বা এর বেশি কিছু নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। আর তা শরিয়তসম্মত একটি 'ইবাদত যদি না কেউ নাযর (মান্নত) করে, নাযরের (মান্নতের) দ্বারা তা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।[২৫]

নারীর জন্য রামাযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা : ইতিকাফ নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই সুন্নাত এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় ইতিকাফ করেছেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পরও ইতিকাফ পালন করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ)، يَعْتَكِفُ فِيْ العَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ (ﷺ) رَأَى الْأَخْبِيَةَ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : أَلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

"রামাযানের শেষ দশকে নবী (ﷺ) ইতিকাফ করতেন। আমি তাঁবু তৈরি করে দিতাম। তিনি ফজরের সালাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী স্ত্রী) হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁবু খাটাবার জন্য 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলে হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁবু খাটালেন। (নবী স্ত্রী) যয়নাব বিনতু জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা দেখে আরেকটি তাঁবু তৈরি করলেন। সকালে নবী (ﷺ) তাঁবুগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো এগুলো দিয়ে নেকি হাসিল হবে? এ মাসে তিনি ইতিকাফ ত্যাগ করলেন এবং পরে শাওয়াল মাসে ১০ দিন (কাযাস্বরূপ) ইতিকাফ করেন।"[২৬] 'আউন আল মা'বূদ গ্রন্থে বলা হয়েছে– "এতে দলিল পাওয়া যায় যে, ইতিকাফের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমতুল্য।"

শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায বলেছেন, 'ইতিকাফ নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাত, নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রামাযানে ইতিকাফ পালন করতেন এবং সবশেষে তাঁর ইতিকাফ শেষ দশদিনে স্থির হয় এবং তাঁর কিছু স্ত্রীগণও তাঁর সাথে ইতিকাফ পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর (মৃত্যুর) পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ পালন করতেন। আর ইতিকাফের জায়গা হচ্ছে মসজিদসমূহ; যেখানে জামা'আতে সালাত আদায় করা হয়।"

ইতিকাফ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শর্ত :

১. স্বামীর অনুমতি : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলারা ইতিকাফ করতে পারবে না। যেমন- 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইতিকাফের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তদ্রূপ হাফসাহ্ ও যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও অনুমতি চেয়েছিলেন।[২৭]

২. ফিৎনার আশংকা না থাকা : মহিলার জন্য ইতিকাফ করা বৈধ হবে না, যদি তার ব্যাপারে কোনো আশংকা কিংবা তার কারণে অন্য কোনো পুরুষ ফিৎনায় পড়ার আশংকা থাকে। সব ধরনের ফিৎনা থেকে নিরাপদ হলে মহিলাদের ইতিকাফ করা বৈধ হবে।[২৮]

মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে মসজিদে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ যখন ইতিকাফ করতেন, তখন মসজিদে তাদের জন্য আলাদা তাঁবু টানানো হত। কেননা, মসজিদে পুরুষরা সালাতের জন্য উপস্থিত হয়। তাই মসজিদে মহিলাদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ প্রয়োজন যেখানে পুরুষরা তাদেরকে দেখতে না পায়। মূলতঃ মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকাই উত্তম।[২৯]

মহিলাদের ইতিকাফের জন্যও কি মসজিদ আবশ্যক; না-কি নিজ গৃহে ইতিকাফ করবে?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদেই ইতিকাফ করেছেন এবং তাঁর সহধর্মিণীগণ ইতিকাফ করতে চাইলে, তাঁদেরকেও মসজিদের পর্দাবৃত্ত স্থান নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"আর তোমরা মসজিদসমূহে ইতিকাফ অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করো না।"[৩০]

---

[২৪] *আল মুহাল্লা- ইবনু হাযম, ৫/১৭৯।*
[২৫] *মাজমূআল ফাতাওয়া- ১৫/৪৪১।*
[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৩।*
[২৭] *বুখারী- হা. ২০৩৩, ২০৪১-৪৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭২-৭৩।*
[২৮] *সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- পৃ. ১৫২।*
[২৯] *ফিকহুস্ সুন্নাহ লিন্নিসা- মাকতাবাতুত্ তাওফিকিয়্যাহ, পৃ. ২৪৭।*
[৩০] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭।*

মহিলারা নিজগৃহে ইতিকাফ করবে– এ মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। যারা বলেন, এটা তাদের অনুমাননির্ভর কথা, যা সুন্নাহ পরিপন্থি; বরং সহীহ সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

«وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ».

"ইতিকাফ কেবল জামি' মসজিদে হতে হবে।"[৩১]

এ হাদীস দ্বারা পুরুষদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং এ নির্দেশ নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত। ইবনু কুদামাহ্ বলেছেন, "একজন নারী যে কোনো প্রকারের মসজিদে ইতিকাফ করতে পারেন। সেটা পাঞ্জেগানা মসজিদ তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আত হয় এমন মসজিদ হওয়া শর্ত নয়। কারণ, জামা'আতে নামায আদায় করা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।"[৩২] ইমাম নববী বলেছেন, "নর-নারী কারো জন্য মসজিদের বাইরে ইতিকাফ করা শুদ্ধ নয়।"[৩৩] শাইখ 'উসাইমীনও এ রকম অভিমত প্রদান করেছেন।[৩৪]

শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহু) বলেছেন : "ইতিকাফ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাত। নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রামাযানে ইতিকাফ পালন করতেন। সবশেষে তাঁর ইতিকাফ রামাযানের শেষ দশদিনে স্থির হয় এবং তাঁর কয়েকজন স্ত্রীও তাঁর সাথে ইতিকাফ পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁরা ইতিকাফ পালন করেছেন। ইতিকাফের স্থান হচ্ছে– এমন মসজিদ যেখানে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা হয়।"[৩৫]

মসজিদের মধ্যে মহিলাদের যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে এবং তার ইতিকাফের কারণে যদি সন্তান প্রতিপালন, ঘর-সংসারের নিরাপত্তা এবং তার উপর অর্পিত অপরিহার্য কর্তব্য পালনে ব্যাঘাত না ঘটে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইতিকাফ করা বৈধ হবে। অন্যথায়, তার জন্য ইতিকাফ না করে; বরং নিজ দায়িত্ব যাথাযথভাবে পালন, সংসার দেখাশুনা, স্বামীর সেবা ইত্যাদিতেই অগণিত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি কাজের ফাঁকে যথাসাধ্য দু'আ, তাসবীহ, কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত ইত্যাদির মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবেন।

ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কথা বলা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রী সাফিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে কথা বলেছেন। সাফিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাথে অনেক্ষণ কথা বললেন। এরপর তিনি উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাথে উঠলেন এবং মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।[৩৬]

মুস্তাহাযা মহিলার ইতিকাফ করা জায়িয : মুস্তাহাযা মহিলার ইতিকাফ করা জায়িয। তবে তাকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন মসজিদে নাপাকী না লাগে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে তাঁর এক মুস্তাহাযা স্ত্রী ইতিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর লাল ও হলুদ বর্ণের রক্ত প্রবাহিত হত। সালাত আদায়কালে আমরা অনেক সময় তাঁর নীচে পাত্র রাখতাম।[৩৭]

উপসংহার : রামাযানের ইতিকাফের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন মু'মিন জীবনের পরম প্রত্যাশিত বস্তু। মহান আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া মু'মিনের কোনো সফলতা নেই। যারা মহান আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করবে, দুনিয়া-আখিরাতে তাদের কোনো ভয়ভীতি নেই। ভালোবাসা তৈরির অন্যতম এক মাধ্যম হচ্ছে– ইতিকাফ।

দুনিয়ার বুকে মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদ। ইতিকাফের মাধ্যমে মসজিদের সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরি হয়। ইতিকাফকারী পুরো সময় মহান আল্লাহর ঘর মসজিদে কাটায়। এর মাধ্যমে সময়ের হিফাযত হয়।

ইতিকাফের সময় মসজিদে সময় কাটানোর কারণে নানাবিধ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ মেলে। অন্য সময় পাপের অনুকূল পরিবেশ, অসৎসঙ্গের প্রভাব ও শয়তানের সার্বক্ষণিক প্ররোচনায় গুনাহমুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইতিকাফের সময়গুলোতে সৎসঙ্গ ও 'ইবাদতের পরিবেশ থাকায় খুব সহজেই সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অর্থ হলো– অধিক 'ইবাদতের সুযোগ। এ জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইতিকাফের সময়গুলোতে 'ইবাদতের মাত্রা এত বেশি বাড়িয়ে দিতেন, যেমনটি অন্য সময় করতেন না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'যখন রামাযানের শেষ ১০ রাত আসত, তখন নবী করীম (ﷺ) কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়তেন (বেশি বেশি 'ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন। আর পরিবার-পরিজনকেও তিনি জাগিয়ে দিতেন।'[৩৮] ❑

---

[৩১] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪৭৩।*
[৩২] *আল-মুগনী- ৪/৪৬৪।*
[৩৩] *আল মাজমূ' - ইমাম নববী, ৬/৪৮০।*
[৩৪] *আশ্ শারহ আল মুমতি- ৬/৫১৩।*
[৩৫] *ইন্টারনেটে শাইখ বিন বাযের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।*
[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৩৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২১৭৫।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩০৯; সুনান আদ্ দারেমী- হা. ৮৭৭।*
[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০৫৩।*

প্রবন্ধ

নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখ গাঁথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[সপ্তম পর্ব]

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। বেঁচে থাকার প্রশ্নে সুস্থতা সকলের কাম্য। সুস্থতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত খাবার। শরীরের পুষ্টি সাধনে মাংসের বিকল্প নেই। পুষ্টিবিদদের অভিমত, অন্যান্য মাংসের তুলনায় গরুর মাংসের খাদ্যমান চমৎকার। কেননা, গরুর মাংসে রয়েছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, মিনারেলস বা খনিজ উপাদান; জিঙ্ক, সেলোনিয়াম, ফসফরাস, আয়রন প্রভৃতি। গরুর মাংস ভিটামিনের প্রাচুর্যে ভরা। ভিটামিন বি২, বি৩, বি৬ এবং বি১২ অন্যতম। এ সকল উপাদান লাভের জন্য মানুষ গরুর মাংস ভক্ষণ করে। স্বাদ ও মানে অনন্য বটে। গরুর মাংস ভক্ষণের ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। পেশী, দাঁত ও হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতে বিপত্তি দেখা দিয়েছে গো-পবিত্রতার অজুহাত তুলে।

বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা যেতে পারে। ভারতে গো-মাংস নিষিদ্ধ করণের প্রক্রিয়া চলছে। মানুষের অভিরুচি মোতাবেক খাদ্য অধিকার রয়েছে। সে অধিকার লঙ্ঘন করে রাজ্য বিশেষে কঠিন আইন প্রয়োগ করতে চলেছে। বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যসমূহে নিষিদ্ধকরণের উদ্যোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। গো মাংস ভক্ষণ কিংবা বহন দু'টিতেই মানুষের জীবন সংহারের মতো ঘটনা ঘটছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এবং বহুবিধ কারণে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। হয়েছে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপকর্মও। বছরখানেক আগে উত্তর প্রদেশের দাদরি গ্রামে মোহাম্মদ আখলাক নামের এক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে পিটিয়ে ও পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। অতিসম্প্রতি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারে গরুর গোশত বহনের অভিযোগে এক মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার ওই ব্যক্তির নাম নাসিম কোরেশি (৬৫)। উক্ত রাজ্যের রসুলপুর থানার পুলিশ প্রধান রামচন্দ্র তিওয়ারী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, পুলিশ ভিকটিমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? উগ্রবাদী হিন্দু গোষ্ঠীগুলো ভারত জুড়ে গরু জবাই পুরোদমে নিষিদ্ধ করার এজেন্ডা বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ভারতে নানা অজুহাতে হত্যা-ধর্ষণ সাধারণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রধানত সংখ্যালঘু মুসলিম জনসংখ্যার মানুষ বা ভারতের প্রাচীন বর্ণপ্রথায় যাদের নিঁচুস্তরের হিসেবে গণ্য করা হয় তারাই এ আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। বিশেষতঃ মুসলিমদের উপর খড়্গহস্ত বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু সেটি তো উপলক্ষ হতে পারে না। নিম্নবর্গীয়, সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন কিংবা গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণ সংবিধানিকভাবে কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষ বিশাল ভারতে এমনি ধরনের আক্রমণ ও অনাচার কাম্য হতে পারে না। বছর বিশেক আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝাঁ তাঁর সুলিখিত The myth of the holy cow গ্রন্থে গো হত্যা নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেন : প্রাচীন ভারতে বহু শতক ধরে গরুর মাংস খাওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। তার প্রমাণ প্রাচীন ভারতীয় লেখায় বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ আছ। 'গরু-বলয়' নামে পরিচিত এসব অঞ্চল থেকেই নেপথ্যের চাপ ও অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে গোমাংস ভক্ষণের রেওয়াজ উঠে যায়। তবে দেশের অনেক অংশে গোমাংস ভক্ষণের ঐতিহ্য চালু আছে। কেরালা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এখনো অভিরুচি ও সুস্বাস্থ্য বহাল থাকার জন্য এ অভ্যাস চালু রয়েছে। ডি এন ঝাঁ-এর গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, কেরালায় অন্তত ৭২টি সম্প্রদায় গরু খায় এবং এদের অনেকেই হিন্দু।

মেঘালয় রাজ্যে নির্দ্বিধায় গো-মাংস ভক্ষণ আজও চলছে। শুধু তাই-ই নয়, গেরুয়া শিবিরের প্রখ্যাত বিজেপি প্রধান আরমেস্ট মাউরি গো-মাংস ভক্ষণে কোনো অপরাধ দেখছেন না। তিনি বলেছেন, মেঘালয়ে গরুর মাংস খাওয়ায় কোনো বাধা নেই। কারণ, এটি এখন লাইফস্টাইল। মাওরি জানিয়েছেন, তিনি নিজেও গো-মাংস ভক্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন, অন্যান্য রাজ্যে

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

গো-মাংস বিরোধী যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তা নিয়ে কোনো মতামত দিতে চান না। তবে আমরা মেঘালয়ে থাকি। এখানে কোনো মাংস খাওয়ার উপরেই কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এখানে সকলে গো-মাংস খেয়ে থাকেন। কারণ, এটা মেঘালয়ের মানুষের জীবনযাত্রার অংশ। এটা কেউ আটকাতে পারে না এবং ভারতেও এ রকম কোনো নিয়ম নেই বলে তিনি জানান। মাওরির সূত্র ধরে আমাদের অনুসন্ধান মতে প্রমাণিত সত্য যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে গো-মাংস ভক্ষণের চল ছিল। সনাতন শাস্ত্র সামবেদের একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে– যার নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' হবে এবং গো-মাংস খাওয়ার আদেশ দিবেন, সেই দেবতাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড়ো দেবতা।

"মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃত্তিতা।
বৃষানাং বক্ষয়েত সদামেদা শাস্ত্রে চস্মৃতা।"

অর্থ : "যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' ও শেষ অক্ষর 'দ' এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সব কালের জন্য পুনঃ বৈধ করিবেন, তিনিই হবেন বেদানুযায়ী ঋষি।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এই ভারত বর্ষেই এমন একদিন ছিল যখন কোনো ব্রাহ্মণ গরুর মাংস না খেলে ব্রাহ্মণই থাকতে পারতেন না। যখন কোনো সন্যাসী রাজা কিংবা বড়ো মানুষ বাড়িতে আসতেন তখন সবচেয়ে বড়ো ষাড়টাকে জবেহ করা হত।[৩৯]

ঋগ্বেদের প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্য সায়ন লিখেছেন, 'You (O Inara) eat the cattle offered as oblations beloning to the worshippers who wok them for you.[৪০] ইন্দ্র[৪১] ভক্তরা প্রার্থনা করছে; হে ইন্দ্র গ্রহণ করো সেসব গরুর মাংস যা তোমাকে তোমার ভক্তরা রন্ধন করে উৎসর্গ করছে। ইন্দ্রের গো-মাংস বড়োই পছন্দের ছিল। আবেগাপ্লুত হয়ে ইন্দ্র বলেন, "The worshippers dress for me fifteen (and) twenty bulls: I eat them and (become) fat, They fill both sides of my belly"।

উপনিষদেও গরু মাংস ভক্ষণের নানান উপমা উৎপ্রেক্ষার বিশদ বর্ণনা মেলে উক্ত গ্রন্থে গো-মাংসের নানা উপকারিতা ও প্রাপ্তির যোগ বিষয়ে আলোচনা আছে। তাতে উল্লেখ আছে, ভালো সন্তান পাবার জন্য ষাঁড়ের মাংস খাওয়া উচিত। সর্বাধিক মেধাসম্পন্ন উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের উপায় হিসেবে উপনিষদের ৬/৪/১৮ শ্লোকে গো-মাংসের কথা বলা আছে। তাতে উল্লেখ আছে Super-scientific way of giving birth to a super intelligent child. এ ব্যাপারে আরো স্পষ্ট বিধান মনুসংহিতাতে দৃষ্ট হয়। মনুসংহিতার ৫/৪৪ নং শ্লোকে বলা আছে, "শ্রুতিবিহিত যে পশু হত্যা, তাহাকে অহিংসাই বলিতে হইবে, যেহেতু বেদ ইহা বলিতেছে।" অগ্নির[৪২] কাছে নিবেদনে বলদ ষাড় এবং দুগ্ধহীনা গাভী বলিদানের উল্লেখ আছে।[৪৩] কিশোরী মোহন গাংগুলি অনূদিত মহাভারতের বনপর্বে গরু খাওয়ার কথা জানা যায়। বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণদের গো-মাংস খাইয়ে হবিষ্য[৪৪] করালে পিতৃগণ ১১ মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। আর এ স্থায়িত্বকালই সবচাইতে দীর্ঘ। বেদ গ্রন্থসমূহে পয়স্বিনী[৪৫] গাভী মানুষের ভজনীয়।[৪৬] আর এ জন্যই হয়তোবা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, You will be astonished if tell you that aecording to the old ceremonials, he is not a good hindu who does not eat beef: On certain occassions he must sacrifece bull and eat it.[৪৭]

অদ্বৈত বেদান্ত শাখার প্রতিষ্ঠাতা শংকরাচার্যের গীতি ভাষ্য হিন্দু ধর্মীয় পণ্ডিত মহলে অত্যন্ত বিখ্যাত। তিনি ব্রাহ্মসুত্র অধ্যাড- ৩, পাদ্য- ১, সূত্র- ২৫-এ লিখেছেন, "যজ্ঞে পশু হত্যা পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ শাস্ত্রই ইহার অনুমোদন দিয়েছে।" ❑

---

[৩৯] Collected works of Swami Vivekananda, *Advaita Asharama, 1963, vol: III, P: 172*।

[৪০] Atharvaveda: 9/4/1।

[৪১] ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে অন্যতম। পুরাণ মতে, তিনি পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতির পুত্র। বেদে ঋবিগণ তাঁকে দেরবাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রে ইন্দ্র কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যমানবস্তু বা মূতিনন, তিনি হচ্ছেন বৃষ্টি বর্ষণের কারণ, সুর্য। বস্তুত ইন্দ্র হচ্ছে ইশ্বর বা পরম ব্রহ্ম; যিনি ঈশ্বরের বর্ষণশক্তির বিকাশস্থল। ইন্দ্রের পৌরানিক কাহিনী এবং ক্ষমতা অন্যান্য ইন্দো ইউরোপীয় দেবতা যেমন জুপিটার, পেরুন, দারকুনাস, জালামক্সিস, তারানিস, জিউস ও থর এবং বৃহত্তর প্রোটো-ইন্দো ইউরোপীয় পুরাণের অংশ। ইন্দ্র দেবেন্দ্রে, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরপতি, সুরেশ, দেবেশ, দেবরাজ, অমরেশ পজন্য প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

[৪২] হিন্দু শাস্ত্রে অগ্নি পৃথিবীর দেবতা। স্বর্গ ও মর্ত্যের যোগাযোগ রক্ষাকারী দেবতা। বৈদিক যজ্ঞের সাথে অগ্নির নাম সংযুক্ত আছে।

[৪৩] ঋগ্বেদ সংহিতা- ১/১৬২/১১-১৩; ৬/১৭/১১; ১০/১১/১৪।

[৪৪] হবিষ্য হলো সকল প্রকার ভোগ পরিত্যাগ করে এক বেলা এক সিদ্ধ আতপ চালের ভাত খাওয়া, সামান্য অনাড়ম্বর বিছানা ব্যবহার, দু'খণ্ড কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পালিত কৃচ্ছ সাধন হলো জবিষ্য করণ।

[৪৫] প্রচুর দুধ দেয় এমনি ধরনের গাভী।

[৪৬] বেদ- ৪/১/৬।

[৪৭] The complete works of Swami Vivekananda, Vol. 3, P. 536।

লাইলাতুল ক্বদ্‌র বা শবে ক্বদ্‌র কোন রাতটি?

–মাকসুদুর রহমান*

রামাযান মাসকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা উম্মতকে এ রাতে অফুরন্ত সাওয়াব ও কল্যাণ দান করে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাব আল-কুরআনে এ রাতের মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেছেন :

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾

"নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে; নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়, আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, নিশ্চয় আমরা রাসূল প্রেরণকারী। আপনার রবের রহমতস্বরূপ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ... আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও রব।"[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে মুবারক বলে গুণান্বিত করেছেন; কারণ, এতে রয়েছে অত্যাধিক কল্যাণ, বরকত ও মর্যাদা।

এ রাতের বরকতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এ বরকতময় কুরআন ওই রাতেই নাযিল হয়েছে। এর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন যে, এ রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়, অর্থাৎ- লাওহে মাহফূয থেকে লেখক ফেরেশ্‌তাদের কাছে স্থিরিকৃত হয়, এ বছর মহান আল্লাহর নির্দেশে রিজিক, বয়স সীমা, ভালো ও মন্দ ইত্যাদি যত প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ রয়েছে সবই। এ সবই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও হিকমতপূর্ণ নির্দেশ যাতে নেই কোনো দোষ, কমতি, অবিবেচনাপ্রসূত কিংবা বাতিল কিছু; সর্বজ্ঞ, মহাসম্মানিতের কাছ থেকে সুনির্ধারিতরূপে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল ক্বদ্‌রে; আর আপনি কী জানেন লাইলাতুল ক্বদ্‌র কী? লাইলাতুল ক্বদ্‌র হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশ্‌তাগণ ও রূহ্ নাযিল হয় তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে। শান্তিময় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।"[৪৯]

কিন্তু লাইলাতুল ক্বদ্‌র বা শবে ক্বদ্‌র কোন রাতে রয়েছে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আলেমগণ অনেকগুলো মতে মতভিন্নতা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেছেন,

"আলেমগণ লাইলাতুল ক্বদ্‌র নির্ধারণের ব্যাপারে বিশাল মতানৈক্য করেছেন। আমাদের নিকট এ ব্যাপারে আলেমগণের চল্লিশেরও অধিক মত রয়েছে।"[৫০]

এরপর তিনি ৪৬টি মত উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে বলেছেন, "এই মতগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য মত হলো এই রাতটি শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং এই রাতটি স্থানান্তরিত হয়, যেমনটি এই অধ্যায়ের হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়। শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলো লাইলাতুল ক্বদ্‌র হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক।"[৫১]

আবার লাইলাতুল ক্বদ্‌র শেষ দশকের জোড় রাতগুলোতেও হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আমরা পর্যায়ক্রমে দলিলসমূহ উল্লেখ করব। প্রথমেই উল্লেখ করব বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র হওয়ার দলিল।

১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

"আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রামাযান মাসের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করেন। বিশ তারিখ অতীত হওয়ার সন্ধ্যায় এবং একুশ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ই'তিকাফ করেছিলেন, তাঁদের সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে প্রস্থান করেন এবং তিনি যে মাসে ই'তিকাফ করেন ওই মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশা-আল্লাহ, তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন। তারপর বলেন, আমি এই দশকে

---

* *শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস্ সালাফিয়্যাহ্, রাণীবাজার, রাজশাহী।*

[৪৮] *সূরা আদ্ দুখা-ন : ৩-৮।*

[৪৯] *সূরা আল ক্বদ্‌র : ১-৫।*

[৫০] *ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী- হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ-র), খণ্ড : ৪, পৃ. ২৬২, হা. ২০২২-এর ভাষ্য, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত, সন-তারিখ বিহীন।*

[৫১] *প্রাগুক্ত- খণ্ড : ৪, পৃ. ২৬৬।*

ই'তিকাফ করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, শেষ দশকে ই'তিকাফ করব। যে আমার সঙ্গে ই'তিকাফ করেছিল, সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, "শেষ দশকে ওই রাতের তালাশ করো এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা তালাশ করো। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ওই রাতে আমি কাদা-পানিতে সাজদাহ্ করছি।" ওই রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চার হয় এবং বৃষ্টি হয়। মসজিদে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নামাযের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল একুশ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের নামায শেষে ফিরে বসেন, তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমণ্ডল কাদা-পানি মাখা।"[৫২]

২. 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

"তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান করো।"[৫৩]

৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِيْ صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ. قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ فَصَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ.

"আমাকে ক্বদ্‌রের রাত দেখানো হয়েছিল। তারপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে ওই রাতের ভোর সম্পর্কে স্বপ্নে আরও দেখানো হয়েছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সাজদাহ্ করছি।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর ত্রয়োবিংশ (২৩তম) রাতে বৃষ্টি হলো এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে (ফজরের) নামায আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন আমরা তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম।[৫৪]

পক্ষান্তরে জোড় রাতগুলোতেও লাইলাতুল ক্বদ্‌র সংঘটিত হতে পারে। এর দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْتَمِسُوْا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ.

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তা শেষ দশকে, তা (প্রথম দিক থেকে গণনায়) অতিবাহিত নবম রাতে, অথবা (শেষ দিক থেকে গণনায়) অবশিষ্ট সপ্তম রাতে; অর্থাৎ- লাইলাতুল ক্বদ্‌র।" ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, "তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ করো।"[৫৫]

২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "হে লোক সকল! আমাকে লাইলাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে এলাম। কিন্তু দুইজন ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হলো এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি। অতএব, তোমরা তা রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ করো, তোমরা তা ৯ম, ৭ম ও ৫ম রাতে অন্বেষণ করো।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ সা'ঈদ! আপনি সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরাই এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক হক্বদার। আমি বললাম ৯ম, ৭ম, ৫ম সংখ্যাগুলো কী? তিনি বললেন, "যখন একবিংশ রাত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং দ্বাবিংশ রাত শুরু হয় তখন তা হচ্ছে ৯ম তারিখ, ত্রয়োবিংশ রাত অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী রাত হচ্ছে ৭ম তারিখ এবং পঞ্চবিংশ রাত অতিবাহিত হবার পরের রাতটি হচ্ছে ৫ম তারিখ।"[৫৬]

৩. আমভাবে রাসূল (ﷺ) শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান করতে বলেছেন। আম্মিজান আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা রামাযান শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান করো।"[৫৭]

---

[৫২] *বুখারী- অনুচ্ছেদ : রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করা, হা. ২০১৮; মুসলিম- হা. ১১৬৭।*

[৫৩] *সহীহুল বুখারী- অনুচ্ছেদ : রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করা, হা. ২০১৭।*

[৫৪] *সহীহ মুসলিম- অনুচ্ছেদ : লাইলাতুল ক্বদ্‌র-এর ফাযীলাত, এর অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান, তা কখন হবে তার বর্ণনা এবং তার অনুসন্ধানের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সময়, হা. ১১৬৮।*

[৫৫] *সহীহুল বুখারী- অনুচ্ছেদ : রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করা, হা. ২০২২।*

[৫৬] *সহীহ মুসলিম- অনুচ্ছেদ : লাইলাতুল ক্বদ্‌র-এর ফাযীলাত, এর অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান, তা কখন হবে তার বর্ণনা এবং তার অনুসন্ধানের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সময়, হা. ১১৬৭।*

[৫৭] *বুখারী- অধ্যায় : রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করা, হা. ২০২০; মুসলিম- হা. ১১৬৯।*

তবে বিজোড় রাতগুলো বেশি আশাব্যঞ্জক। আর বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে ২৭শের রাত সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার ইবনু হুবাইস (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

যখন উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলা হলো– 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জেগে নামায আদায় করবে, সে লাইলাতুল ক্বদ্‌র প্রাপ্ত হবে।" তখন তিনি বললেন, "যিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, সেই মহান আল্লাহর কসম! নিশ্চিতভাবে লাইলাতুল ক্বদ্‌র রামাযান মাসে। এ কথা বলতে তিনি ক্বসম করলেন কিন্তু ইন্‌শা-আল্লাহ বললেন না (অর্থাৎ- তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতেন যে, রামাযান মাসের মধ্যেই লাইলাতুল ক্বদ্‌র আছে)।" এরপর তিনি আবার বললেন, "আল্লাহর কসম! কোন রাতটি ক্বদ্‌রের রাত তাও আমি জানি। সেটি হলো সেই রাত, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নামায আদায় করতে আদেশ করেছেন। ২৭শে রামাযান তারিখ সকালের পূর্বের রাতটি সেই রাত। আর ওই রাতের নিদর্শন হলো সে রাত শেষে সকালে সূর্য উদিত হবে, তা উজ্জ্বল হবে কিন্তু সে সময় (উদয়ের সময়) তার কোনো তীব্র আলোকরশ্মি থাকবে না (অর্থাৎ- অন্য দিনের তুলনায় কিছুটা নিস্প্রভ হবে)।"[৫৮]

মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা ২৭শে রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান করো।"[৫৯]

আবার শেষ দশকের মধ্যে শেষ সাতদিন অধিক আশাব্যঞ্জক। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত,

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নের মাধ্যমে রামাযানের শেষের সাত রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র দেখানো হয়। (এ শুনে) আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি এর সন্ধানপ্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে তা সন্ধান করে।"[৬০]

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ২৭শে রাতই লাইলাতুল ক্বদ্‌র বা শেষ সাতদিনেই লাইলাতুল ক্বদ্‌র রয়েছে অথবা কেবলমাত্র বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান করলেই এই রাত পাওয়া যাবে; বরং শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই লাইলাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান করতে হবে। এমনটিই বুঝেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ইমাম ইবনু বায, ইমাম ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন) প্রমুখ বিদ্বানগণ।

আমরা তাঁদের গবেষণালব্ধ ফাতাওয়ার অনুবাদ নিম্নে উল্লেখ করছি–

১ম ফাতাওয়া : হিজরি ৮ম শতাব্দীর অবিস্মরণীয় মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম ইমাম তাক্বিউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ বিন 'আব্দুল হালীম বিন তাইমিয়্যাহ আল হার্রানী আল হাম্বালী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ৭২৮ হি.)-কে লাইলাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "লাইলাতুল ক্বদ্‌র রামাযান মাসের শেষ দশকে রয়েছে। বিশুদ্ধ সূত্রে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এই রাত রামাযান মাসের শেষ দশকে রয়েছে। এটা শেষ দশকের বিজোড় রাতেও হতে পারে। কিন্তু বিজোড় (রাত) গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনাতেও হতে পারে। তখন তুমি লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করবে একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও ঊনত্রিশতম রাতগুলোতে। (অর্থাৎ- শুরু থেকে এই দশকের রাতগুলো অতিবাহিত বা গত হওয়ার ভিত্তিতে শুরু হবে এই বিজোড় রাতের গণনা। যেমন- এই দশকের প্রথম রাত একুশতম। এই রাত থেকে বিজোড় গণনা শুরু হবে। এভাবে হবে ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলোও। ***–অনুবাদক***

আবার বিজোড় (রাত) অবশিষ্ট থাকার বিবেচনাতেও হতে পারে। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অবশিষ্ট নবম রাত্রি, অবশিষ্ট সপ্তম রাত্রি, অবশিষ্ট পঞ্চম রাত্রি ও অবশিষ্ট তৃতীয় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করো। (অর্থাৎ- শেষ দশক শুরু হলে অবশিষ্ট রাতগুলো হয় শেষের দিকে। অর্থাৎ- ৩০ বা ২৯তম রাত থেকে ২১তম রাত পর্যন্ত।

সুতরাং এই বিবেচনায় বিজোড় গণনা শুরু হবে শেষের দিক থেকে। শেষের দিক থেকে বিজোড় গণনা করলে হয়, অবশিষ্ট ১ম রাত্রি হলো ৩০তম রাত্রি, অবশিষ্ট ৩য় রাত্রি হলো ২৮তম রাত্রি, অবশিষ্ট ৫ম রাত্রি হলো ২৬তম রাত্রি, অবশিষ্ট ৭ম রাত্রি হলো ২৪তম রাত্রি, আর অবশিষ্ট ৯ম রাত্রি হলো ২২তম রাত্রি। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। ***–অনুবাদক***

এর ওপর ভিত্তি করে মাস যখন ত্রিশে হবে, তখন পূর্বোক্ত রাতগুলো (অর্থাৎ- গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনায় ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলো) জোড় রাত্রি হবে। তখন

---

[৫৮] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : রামাযানে তারাবীহ সলাত আদায় করা প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রদান করা, হা. ৭৬২।*

[৫৯] *সহীহুল জামি'- হা. ১২৪০, সনদ সহীহ।*

[৬০] *সহীহুল বুখারী- অনুচ্ছেদ : (রামাযানের) শেষের সাত রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করা, হা. ২০১৫; মুসলিম- হা. ১১৬৫।*

২২তম রাতটি হবে অবশিষ্ট ৯ম রাত্রি এবং ২৪তম রাতটি হবে অবশিষ্ট ৭ম রাত্রি। বিশুদ্ধ হাদীসে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[৬১] আর নবী (ﷺ) এভাবেই রামাযান মাসে শেষ দশক সম্পন্ন করেছেন। পক্ষান্তরে মাস যদি ঊনত্রিশে হয়, তবে যে তারিখ অবশিষ্ট থাকার বিবেচনায় হয়েছে, তা গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনায় যে তারিখ, তার মতো হবে। (গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনায় তারিখগুলো হয় ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলো। আর অবশিষ্ট থাকার বিবেচনায় ২৯শে মাস হলে, শেষের দিক থেকে গণনা করতে হবে। তখনও তারিখগুলো বিজোড়ই হবে। অর্থাৎ- ২৯, ২৭, ২৫, ২৩ ও ২১তম রাত হবে। *–অনুবাদক*)

বিষয়টি যখন এমনই, তখন মু'মিনের উচিত পুরো শেষ দশকেই ওই রাত তালাশ করা। যেমনটি নবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা ওই রাতটি শেষ দশকে তালাশ করো।[৬২] তবে ওই রাতটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শেষ সাতটি রাতের মধ্যে হয়ে থাকে। আর সাতাশের রাতটিতেও লাইলাতুল ক্বদ্‌র বেশি হয়ে থাকে। যেমন- সাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলফ করে বলেছেন যে, ওই রাতটি হলো সাতাশের রাত। তাঁকে বলা হলো, কীসের মাধ্যমে আপনি এটা জেনেছেন? তিনি বললেন, নিদর্শনের মাধ্যমে, যে নিদর্শনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ওই দিন সকালে সূর্য উদিত হবে, সেদিন সকালের সূর্যটা হবে একটা প্লেটের মতো, আর তার কোনো কিরণ থাকবে না। এই নিদর্শনটি নবী (ﷺ) থেকে উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। এটা হাদীসে বর্ণিত প্রসিদ্ধ নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এরূপ নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই ঐ রাতের ঊষার আলো হবে অনেক উজ্জ্বল।" এই রাতটি হবে প্রশান্তিদায়ক রাত; না হবে খুব গরম, আর না হবে খুব ঠান্ডা। কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো ব্যক্তিকে ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় এই রাতটি জানিয়ে দিতে পারেন। সে হয়ত তখন এর আলো দেখবে, বা কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, যে তাকে বলছে, এটা হলো ক্বদ্‌রের রাত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই রাতটি প্রত্যক্ষ করার জন্য তার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিবেন, যার মাধ্যমে তার কাছে প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।"[৬৩]

[৬১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৭।*
[৬২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২০; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৯।*
[৬৩] *মাজমূ'উ ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ), খণ্ড : ২৫; পৃ. ২৮৪-২৮৬; বাদশাহ ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস, মদিনা, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।*

২য় ফাতাওয়া : সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ ও মুহাদ্দিস শাইখুল ইসলাম ইমাম আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.) বলেছেন, "নবী (ﷺ) জানিয়েছেন যে, লাইলাতুল ক্বদ্‌র রামাযানের শেষ দশকে রয়েছে। আর তা বেজোড় রাতগুলোর কোনো একটিতে সংঘটিত হওয়া বেশি আশাব্যঞ্জক। যেমন- নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা তা অনুসন্ধান করো রামাযানের শেষ দশকে, তোমরা তা অনুসন্ধান করো প্রত্যেক বিজোড় রাতে।"[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ওই রাতটি শেষ দশকের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। প্রতি বছর নির্দিষ্ট এক রাতে হয় না। তাই তা কখনো ২১শের রাতে হতে পারে, কখনো ২৩শের রাতে হতে পারে, কখনো ২৫শের রাতে হতে পারে, কখনো ২৭শের রাতে হতে পারে; ২৭শের এই রাতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কখনো ২৯শের রাতে হতে পারে, আবার কখনো জোড় রাতগুলোতেও হতে পারে।

সুতরাং কেউ যদি শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় ক্বিয়াম করে, তবে নিঃসন্দেহে সে ওই রাতটি পেয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকার এই রাতের অধিবাসীদের (যারা এই রাতে ক্বিয়াম করে) দিয়েছেন তা লাভ করে সফলকাম হবে। নবী (ﷺ) এই দশকের রাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে 'ইবাদত করতে যে অতিরিক্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতেন, সেটা তিনি প্রথম বিশ রামাযানে করতেন না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, "নবী (ﷺ) রামাযানের শেষ দশকে 'ইবাদত করতে যে প্রচেষ্টা করতেন, সে প্রচেষ্টা তিনি অন্য সময় করতেন না।"[৬৫]

তিনি আরও বলেছেন, "রামাযানের শেষ দশক শুরু হবার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সারা রাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন। তিনি নিজেও 'ইবাদতের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতেন এবং লুঙ্গি কষে বাঁধতেন ('ইবাদতে খুব সচেষ্ট থাকতেন)।"[৬৬]

৩য় ফাতাওয়া : বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফাক্বীহ ও উসূলবিদ আশ-শাইখুল আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ

[৬৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৭।*
[৬৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৫।*
[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৪; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুম মুতানাওয়্যিআহ- ইমাম ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ), খণ্ড : ১৫; পৃ. ৪২৬-৪২৮; দারুল ক্বাসিম, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত; সন : ১৪২১ হিজরি, ১ম প্রকাশ।*

বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লা-হ) (মৃত : ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) বলেছেন, "লাইলাতুল ক্বদ্‌র নির্ধারণের ব্যাপারে আলেমগণ চল্লিশেরও অধিক মত পেশ করে মতানৈক্য করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লা-হ) বুখারীর ভাষ্যে মতগুলো উল্লেখ করেছেন। আর লাইলাতুল ক্বদ্‌রের ব্যাপারে কিছু আলোচনা আছে।

প্রথম আলোচনা : লাইলাতুল ক্বদ্‌র কি এখনও অবশিষ্ট আছে, না কি এটা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : বিশুদ্ধ মতানুসারে, কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা অবশিষ্ট আছে। আর যে হাদীসে এটা উঠিয়ে নেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই বছরে নির্দিষ্টভাবে ওই রাতটি জানার 'ইল্‌ম তথা জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া। কেননা ওই বছর নবী (ﷺ) সেই রাতটি দেখেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীবর্গকে এ ব্যাপারে জানানোর জন্য বের হন। তখন দু'জন ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হলো, ফলে ওই বছরে নির্দিষ্টভাবে রাতটি জানার 'ইল্‌মকে উঠিয়ে নেওয়া হলো।[৬৭]

দ্বিতীয় আলোচনা : এই রজনী কি রামাযান মাসে, না কি অন্য কোনো মাসে?

উত্তর : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই রজনী রামাযান মাসেই রয়েছে। এটা দলিলের আলোকেই সাব্যস্ত। তার মধ্যে প্রথমত মহান আল্লাহর বাণী,

"রামাযান মাস, যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[৬৮]

সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রামাযান মাসে। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি ক্বদ্‌রের রাতে।"[৬৯]

সুতরাং যখন তুমি এই আয়াতকে আগের ওই আয়াতের সাথে মিলাবে, তখন লাইলাতুল ক্বদ্‌র রামাযান মাসেই নির্দিষ্ট গণ্য হবে। কেননা এই রাত যদি রামাযান মাসে না হয়, তবে এ কথা বলা বিশুদ্ধ হবে না যে, "রামাযান মাস, যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[৭০]

এটা হলো যৌগিক দলিল। আর যৌগিক দলিল হলো সেই দলিল, যাতে একটি দলিলকে আরেকটির সাথে না মিলানো পর্যন্ত তা থেকে ইস্তিদলাল (দলিল গ্রহণ করা) পূর্ণ হয় না। যৌগিক দলিলের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে এই দৃষ্টান্ত একটি। সেটা হলো– গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল হচ্ছে ছয় মাস, যখন বাচ্চা জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এটা আমরা জেনেছি মহান আল্লাহর বাণী থেকে, "তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস।"[৭১] তিনি অন্যত্র বলেছেন, "তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।"[৭২]

সুতরাং যখন আমরা ত্রিশ মাস থেকে দুই বছর বাদ দিব, তখন অবশিষ্ট থাকবে ছয় মাস। আর এটাই হলো গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল।

তৃতীয় আলোচনা : রামাযানের কোন রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র সংঘটিত হয়?

উত্তর : কুরআনে এই রাত নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে কোনো বর্ণনা নেই। কিন্তু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, এই রাত রামাযানের শেষ দশকেই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাযান মাসের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করলেন। এরপর তিনি মাঝের দশকেও ই'তিকাফ করলেন। তারপর তাঁকে বলা হলো, লাইলাতুল ক্বদ্‌র শেষ দশকে নিহিত আছে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ওই রাতটি স্বপ্নেও দেখানো হলো, তিনি যেন সে রাতে কাঁদা ও পানির মধ্যে ফজরের (নামাযের) সাজদাহ্ করছেন। সেটা ছিল রামাযানের একবিংশ রাতে। তিনি (ﷺ) ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। সে রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে ছাদ থেকে মসজিদে পানি বর্ষিত হলো। তখন নবী (ﷺ)-এর মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর ডাঁটায় তৈরি। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। তিনি জমিনের উপর সাজদাহ্ দিলেন। (বর্ণনাকারী) আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, তিনি কাদা ও পানিতে সাজদাহ্ দিলেন। এমনকি আমি স্বচক্ষে তাঁর কপালে কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম।[৭৩]

একদল সাহাবী (রামাযানের) শেষ সাত রাতে লাইলাতুল ক্বদ্‌র প্রত্যক্ষ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে।" অর্থাৎ- একই রকম হয়েছে। "অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধানপ্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে এর সন্ধান করে।" এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, শেষ দশকের মধ্যে শেষ সাত রাত হলো বেশি আশাব্যঞ্জক।

---

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০২৩।*
[৬৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*
[৬৯] *সূরা আল ক্বদ্‌র : ১।*
[৭০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*
[৭১] *সূরা আল আহক্বা-ফ : ১৫।*
[৭২] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৪।*
[৭৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০১৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৭।*

যদি না রাসূল (ﷺ)-এর কথাটির দ্বারা এই উদ্দেশ্য হয় যে, এটা কেবলমাত্র সেই বছরের জন্যই নির্দিষ্ট– "আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে।"[৭৪] এটি একটি সম্ভবনাময় বিষয়। কেননা, নবী (ﷺ) মৃত্যুঅবধি সম্পূর্ণ শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। সুতরাং এ সম্ভবনা রয়েছে যে, তাঁর কথা "আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে" এর অর্থ হলো– এটা সেই বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যে, শেষ সাত রাতের মধ্যেই লাইলাতুল ক্বদ্‌র নিহিত রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আগামী সমস্ত রামাযানে লাইলাতুল ক্বদ্‌র শেষ সাত রাতের মধ্যে থাকবে; বরং এই ভাগ্য রজনীটি শেষ দশকের পুরোটার মধ্যেই অবশিষ্ট থাকবে।

চতুর্থ আলোচনা : প্রত্যেক বছর লাইলাতুল ক্বদ্‌র কি এক রাতেই হয়ে থাকে, না কি এটা স্থানান্তরিত হয়?

উত্তর : এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, এই রাতটি স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং কোনো বছর ২১তম রাতটিও লাইলাতুল ক্বদ্‌র হতে পারে, আবার কোনো বছর ২৯তম রাতে, কোনো বছর ২৫তম রাতে, কোনো বছর ২৪তম রাতেও লাইলাতুল ক্বদ্‌র হতে পারে এবং অনুরূপভাবে (শেষ দশকের বাকি রাতগুলোতেও) হতে পারে। কেননা, এই কথা ব্যতীত আর অন্য কোনো কথার উপর এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। তবে অধিক আশাব্যঞ্জক রাত হলো ২৭শের রাত। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে এই রাতটিই লাইলাতুল ক্বদ্‌র নয়, যেমনটি কিছুসংখ্যক লোক ধারণা করে থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি তার ধারণার ওপর ভিত্তি করে, এই একটি রাতেই অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করে এবং অন্যান্য রাতগুলোতে শিথিলতা প্রদর্শন করে। এই রাতটি (নির্দিষ্টভাবে একই রাতে না হয়ে, বিভিন্ন রাতে) স্থানান্তরিত হওয়ার পিছনে হিকমাহ এই যে, এই ভাগ্য রজনীটি যদি নির্দিষ্ট কোনো রাতে হতো, তবে অলস বান্দাহ এই একটি রাতে ক্বিয়াম করেই ক্ষান্ত হয়ে যেতো। কিন্তু যখন রাতটি স্থানান্তরিত হবে এবং প্রতিটি রাতেই লইলাতুল ক্বদ্‌র হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তখন ব্যক্তি পুরো শেষ দশকেই ক্বিয়াম করবে। এ ব্যাপারে আরো হিকমাহ এই যে, এতে অলসতা পরিহার করে এই রাত তালাশ করার ব্যাপারে আগ্রহী বান্দার জন্য রয়েছে পরীক্ষা।"[৭৫] ইমাম ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, "তবে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলো অধিক আশাব্যঞ্জক। নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করো, আর তা প্রত্যেক বিজোড় রাতে তালাশ করো।"

শেষ দশকের বিজোড় রাত কোনগুলো?

উত্তর : ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম; এই পাঁচটি রাত এই দশকের মধ্যে অধিক আশাব্যঞ্জক। এর অর্থ এই নয় যে, লাইলাতুল ক্বদ্‌র কেবলমাত্র বেজোড় রাতেই সংঘটিত হয়; বরং এই রাতটি জোড়-বিজোড় উভয় রাতগুলোতে হতে পারে।[৭৬]

কিছুদূর এগিয়ে ইমাম ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, "বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে ক্বদ্‌রের রাত হওয়ার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক ও সম্ভবনাপূর্ণ রাত হলো ২৭তম রাত। কিন্তু লাইলাতুল ক্বদ্‌র নির্দিষ্টভাবে ২৭তম রাতে হবে না।"[৭৭]

২৭তম রাতকে বিশেষ বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার মতামতগুলো বিজ্ঞ আলেমগণের অভিমত মাত্র। এর উপর ভিত্তি করে কেবল ২৭তম রাত পালন কোনোভাবে সমীচিন হবে না; বরং ক্বদরের রাত হারাবার সম্ভাবনাই বেশি দেখা দেবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে লাইলাতুল ক্বদ্‌র তথা শবেক্বদ্‌র শেষ দশকের মধ্যে রয়েছে। তাই এই রাতটি পাওয়ার জন্য শেষ দশকের জোড়-বিজোড় সব রাতেই তালাশ করতে হবে। আর রাসূল (ﷺ)-এর 'আমল এরকমই ছিল। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

যখন রামাযানের শেষ দশদিন আসত, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পরিধেয় বস্ত্রকে শক্ত করে বাঁধতেন, রাত জেগে 'ইবাদত করতেন এবং পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।[৭৮] আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবগত। ❑

---

[৭৪] *সহীহুর বুখারী- হা. ২০১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৫।*

[৭৫] *আশ্ শারহুল মুমতি আলা যাদিল মুস্তাক্বনি- খণ্ড :৬; পৃ. ৪৮৯-৪৯২; দারুল ইবনিল জাওযী- দাম্মাম কর্তৃক প্রকাশিত; সন : ১৪২৪ হিজরি ১ম প্রকাশ।*

[৭৬] *প্রাগুক্ত- খণ্ড : ৬; পৃ. ৪৯৪।*

[৭৭] *প্রাগুক্ত- খণ্ড : ৬; পৃ. ৪৯৫।*

[৭৮] *সহীহুল বুখারী- রামাযানের শেষ দশকের 'আমল, হা. ২০২৪।*

আল্লামাতুশ শাম শাইখ মুহাম্মদ বাহজাহ আল বায়তার (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম

–অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক*

এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সম্পর্কে বাংলা ভাষাতে এটিই হয়ত প্রথম লিখনি। আমাদের দেশের আলেম-উলামা, লেখক, গবেষক, প্রবন্ধকারগণ বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজের নিকট এ মহাপুরুষের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনীকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। যা অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহ্যবাহী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে (১৯৯২ ইং সনে) এম.ফিল পিএইচডির গবেষক থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি "মাওলানা আযাদ লাইব্রেরির" অ্যারাবিক সেকশনে হঠাৎ একখানি আরবি ম্যাগাজিনে আল্লামা বাহজাহ আল-বাইতারের লেখা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ হাতে পাই। সেখান থেকেই তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁর লেখাটি পড়ে সত্যিই অসম্ভব বিস্মিত হই। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় আরবী ভাষাজ্ঞান ও রচনাশৈলী আমাকে চরমভাবে আলোড়িত করে। সে লেখাটি সম্ভবত তিনি এভাবে শুরু করেছিলেন যে, "আমি কেন? পৃথিবীর কোনো কলমেরই সাধ্য নেই যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর কর্মময় ও বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম যথার্থভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।" যেমন- তিনি তার বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ "শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র জীবনী" নামক গ্রন্থে বলেন :

ليس في وسعي أن أحيط وصفاً بمواهب علامة الشرق الإمام أحمد المعروف بابن تيمية الحرّاني الدمشقي، فقد طبق الأرض في عصره علمًا وإصلاحًا، وملأ الكون صدعًا بالحق وجهادًا، وسارت بعلومه الركبان، وعطر أريج شمائله وأعماله الأرجاء. وفي أرض دمشق غرست شجرة الإصلاح بيد ابن تيمية فأثمرت ونضجت، ومن سمائها سطعت شمس السنة الغراء، فأضاءت وعمّت، وفي أجوائها علت صيحة الحق، ففزعت جيوش البدع والأوهام، وليس من غرضي أن أذكر كل ما قيل في ترجمة هذا النابغة الكبير، فهو كما قال الحافظ الذهبي: أعظم من أن تصفه كلمي ، أو ينبه على شأوه قلمي.

অর্থাৎ- প্রাচ্যের আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ নামে খ্যাত ইমাম আহমাদের অসাধারণ প্রতিভার বর্ণনা আমার সাধ্যের বাইরে। যিনি তাঁর যুগে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর 'ইল্‌ম ও সংস্কারের আওতাভুক্ত করে ফেলেছিলেন, হক্ব-এর বজ্রধ্বনি দ্বারা পুরো পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন আর যাঁর 'ইল্‌ম বহন করেছিলেন অসংখ্য কাফেলা। দামেস্কের ভূমিতেই ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র হাতে দ্বীনি সংস্কারের বীজ বপন করা হয়। পরবর্তীতে সেটি ফলদায়ক বিশাল বৃক্ষে রূপ ধারণ করে ও তাঁর ফল উপযুক্ত হয়। আর এই দামেস্কের আকাশ হতেই সমুজ্জ্বল সুন্নতের দীপ্তিময় সূর্যের উদয় ঘটে যা বিশ্বকে আলোকিত করে ও ব্যাপকভাবে যার কিরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ দামেস্কের পরিবেশেই হক্বের বজ্রধ্বনি সমুন্নত হয়, যার ফলশ্রুতিতে বিদআত ও কুসংস্কার বাহিনীর মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাস্তবে তেমনই যেমন তাঁর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, আমার ভাষা ও বাণী এই বিস্ময়কর প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যা বর্ণনা করবে আর আমার কলম তাঁর প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরবে তা হতে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক উর্ধ্বে।

আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বায়তার "শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর জীবনী" গ্রন্থে বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনু বতুতার মিথ্যাচারের দলিলভিত্তিক দাঁত ভাঙা জবাব প্রদান করেন, যা তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) সম্পর্কে করেছেন। ইবনু বতুতা তাঁর সফরনামা তথা বিশ্বভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ "তুহফাতুন নাযযার ফী গারায়িবিল আমসার ওয়া আজায়িবিল আসফার" এ বলেন : একদিন ইবনু তাইমিয়্যাহ্ দামিশক এর মসজিদে জুমু'আর খুতবায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে এই ধরাতে এমনভাবে অবতরণ করেন যেমন আমি এখন অবতরণ করছি এবং মেম্বার হতে এক সিঁড়ি নেমে আসেন। আল্লামা বাহজাহ আল-বায়তার ইবনু

* *মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

বতুতার মিথ্যাচারের বেশ কটি অকাট্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ পেশ করেন যার মধ্যে অন্যতম, ইবনু বতুতা যখন ও যে সময় দামেস্ক নগরীতে যান ও অবস্থান করেন তার কিছু দিন পূর্ব হতেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) দামেস্কর জেলখানায় বন্দী হন এবং আমৃত্যু উক্ত কারাগারেই অবস্থান করেন। অবশ্য ইবনু বতুতাও শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে অগাধ শ্রদ্ধা করেন বলে স্বীয় গ্রন্থে দাবি করেন ও এক পর্যায়ে বলেন : ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) শাম দেশের (সিরিয়ার) এক মহান ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মহাপণ্ডিত এবং সকল দামিশকবাসীর নিকট তিনি খুবই শ্রদ্ধেয় এবং মর্যাদাবান। তাছাড়া আল্লামা বাহজাহ আল-বায়তার (রাহিমাহুল্লা-হ) দ্বাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত ও আনীত বিভিন্ন অপবাদ ও অভিযোগেরও দলিলভিত্তিক খণ্ডন করেন এবং তাঁর দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের বিশদ বর্ণনা দিয়ে কিতাব রচনা করেন এবং বিভিন্ন মূল্যবান পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি চরম গোঁড়া ও তাকলীদ পন্থি এবং আহলে হাদীস ও সালাফী মতাদর্শের চরম বিদ্বেষী আল্লামা যাহেদ কাওসারীর বিরুদ্ধেও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন।

জন্ম, শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

আল্লামাতুশ শাম শাইখ মুহাম্মাদ বাহজাহ আল বাইতারের নাম মুহাম্মাদ বাহজাহ, পিতার নাম মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ও ১৩১১ হিজরিতে শাম দেশের তথা বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেশক নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উর্ধ্বতন দাদা আলজেরিয়া হতে দামেস্ক নগরী চলে আসেন। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন দামেশক এর শীর্ষ আলেমগণের অন্যতম। যিনি কট্টরপন্থী সূফী তরীকার শাইখ ছিলেন, অর্থাৎ- ওয়ালী-আউলীয়াগণ বিশেষ ক্ষমতা রাখেন ও তাঁদের প্রতি সীমাহীন ভক্তি, শ্রদ্ধাবোধ ও তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে উরস উদযাপন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে ছিলেন। আল্লামা শাইখ 'আলী তানভাতী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, শাইখ মুহাম্মাদ বাহজাহ'র পিতা কট্টরপন্থী সূফী ছিলেন যিনি ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ 'আক্বীদাহ্ যার অর্থ হচ্ছে যে সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান বা তিনি সর্বত্র বিরাজমান যা সম্পূর্ণরূপে ঈমান বিধ্বংসী 'আক্বীদাহ্, তাতে বিশ্বাস রাখতেন আর যা ইবনু আরাবী, হাল্লাজ ও ইবনু সাবঈনের মাযহাব নামে পরিচিত।[৭৯]

বাহজাহ নিজ পিতৃকুলে লালিত পালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার নিকটই গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর যুগেরশ্রেষ্ঠ আলেমগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী, আল্লামা রাশীদ রেযা প্রমুখ। তবে আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী দ্বারা সর্বাধিক বেশি প্রভাবিত ছিলেন। আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বায়তায়ের ছেলে আসেম আল-বায়তার বলেন যে, আল্লামা জামালুদ্দিন কাসেমী (রাহিমাহুল্লা-হ)-ই আমার আব্বার মাঝে সালাফী মতাদর্শের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেন এবং আমার আব্বার 'আক্বীদাহ্কে পরিশুদ্ধ করেন। আল্লামা শাইখ জামালুদ্দীন কাসেমী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, যদিও কিছু কিছু বিষয়ে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক আছে কিন্তু সমস্ত বিতর্কেরই ইতি টানতে হয় যে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ বাহজাহ-এর মতো এত উচুঁ মাপের একজন একনিষ্ঠ সালাফী দীনের দাঈ' তৈরি করতে পেরেছিলেন।

সহীহ 'আক্বীদাহ্ প্রচারে অবদান

শাম বা বর্তমান সিরিয়াতে দ্বীন প্রচারে ও সহীহ 'আক্বীদাহ্ বিস্তারে শাইখ মুহাম্মাদ বাহজাহ-এর অবদান অতুলনীয়। শির্ক-বিদআত আচ্ছন্ন সিরিয়ার। সূফীতত্ত্বের জমজমাট সমাজে তিনি সালাফী তথা নির্ভেজাল তাওহীদ বা কিতাব ও সুন্নাহের দাওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর হাতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হন এবং সহীহ 'আক্বীদার সন্ধান লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্ব বরেণ্য সাহিত্যিক 'আলী তানভাতী (রাহিমাহুল্লা-হ)। শাইখ 'আলী তানভাতী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : আমি শাইখ মোহাম্মাদ বাহজাহকে এমন পেলাম যে, তাঁর প্রতিটি বক্তব্য আমি যে বিশ্বাসের উপর বড়ো হয়েছিলাম সেগুলোকে চুরমার করে দিলো। আমি তো 'আক্বীদার ক্ষেত্রে আশ'আরী-মাতুরীদী চিন্তাধারার ছিলাম যার ভিত্তি অনেকটাই ইউনানী তথা গ্রীক দর্শনের উপর, তারা যা কিছু আমাকে শিখিয়েছিলেন আর আমি সেগুলোর উপরই বিশ্বাস করতাম, আর তা ছিল এ রকম যে, আসমায়ে সিফাতের তাওহীদের ক্ষেত্রে সালাফগণের মাযহাবই

[৭৯] *রেজালুম মিনাত তা'রীখ- ৪১৬-৪১৭ পৃ.।*

নিরাপদ তবে খালাফ তথা পরবর্তীগণের (আশ'আরী মাতুরীদিগণের) মাযহাবই বেশি সঠিক ও হিকমতপূর্ণ। কিন্তু শাইখ বাহজাহই আমাদের শিখালেন যে, সালাফগণ যা কিছুর উপরে আছেন তাই হচ্ছে নিরাপদ এবং বেশি সঠিক ও হিকমত পূর্ণ। শাইখ 'আলী তানতাভী (রাহিমাহুল্লা-হ) আরো বলেন যে, আমি ইবনু তাইমিয়্যাহ্ হতে দূরত্ব বজায়, ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর বড়ো হয়েছিলাম, কিন্তু আল্লামা বাহজাহ এসে আমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটালেন। আমার মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা জন্মলাভ করলো। আমি হানাফী ছিলাম এবং কঠোর ও গোঁড়া হানাফী ছিলাম। তিনিই আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, মাযহাবী তাআসসুব বা গোঁড়ামি অনুচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দলিলকেই অনুসরণ করা কাম্য। সুতরাং আমি শাইখ বাহজাহ দ্বারা প্রভাবিত হলাম এবং তিনি যে মতাদর্শ লালন করতেন আমি তাই গ্রহণ করে ফেললাম অর্থাৎ- সালাফী বা আহলে হাদীস হয়ে গেলাম। তবে তা এমনি এমনিই নয়; বরং তার সাথে অসংখ্য বাহাস, তর্ক-বিতর্ক ও মুনাযায়ার পর।[৮০] আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অগ্রদূত আল্লামা শাইখ 'আলী তানতাভী (রাহিমাহুল্লা-হ) আরো বলেন যে, শাইখ বাহজাহ-এর সাথে আমার গভীরতম সম্পর্ক আমার অন্যান্য শাইখ-মাশায়েখ ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। কেননা শাম দেশের অধিকাংশ শাইখ-মাশায়েখগণই সূফীপন্থী ছিলেন এবং ওয়াহাবী মাযহাবকে অপছন্দ করতেন। অথচ তাঁরা জানতেন না যে, সমগ্র পৃথিবীতে ওয়াহাবী মাযহাব নামে কোনো মাযহাবই নেই। আমাদের মাঝে শাইখ-মাশায়েখগণের একটা জামা'আত বা শ্রেণি ছিল, যাদেরকে ওয়াহাবী বলা হতো আর তাদের শীর্ষে ছিলেন শাইখ মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বায়তার।

বহুমুখী প্রতিভার সমাহার

আল্লামা শাইখ বাহজাহ আল-বায়তার (রাহিমাহুল্লা-হ) এমন এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বহুমুখী প্রতিভার সমাহার ঘটিয়েছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, দাঈ' অনুরূপ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফকীহ, সমাজ সংস্কারক, ইতিহাসবিদ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাগ্মী। উপরোল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অসামান্য অবদান ও অবধ বিচরণ।

[৮০] *রেজালুম মিনাত তারীখে- 'আলী তানতাভী, ৪১৬ পৃ.।*

কর্মক্ষেত্র

সিরিয়া, হেজায ও লেবাননের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি শিক্ষকতা করেন। দামেস্কের কুল্লিয়া শারঈয়াহ ও কুল্লিয়াতুল আদাবেও অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করেন। তিনি দামেস্কের আরবি ভাষা ও গবেষণা একাডেমির সদস্য মনোনীত হন এবং এর গবেষণাধর্মী পত্রিকার সম্পাদকের পদেও দায়িত্ব পালন করেন। পবিত্র মক্কা মুকাররামাতে ১৩৪৫ হিজরিতে যে ঐতিহাসিক ইসলামী বিশ্বের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি যোগদান করেন। পরবর্তীতে সৌদি আরবের মহামান্য বাদশা আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁকে মক্কাস্থ আল-মা'হাদ আল-'ইল্‌মী আল সৌদির মহা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এরপর তাঁকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। অতঃপর সেখান হতে অব্যাহতি দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক পদে নিয়োগ দেন। পাশাপাশি হারাম শরীফে আলোচকের দায়িত্ব দেন। অতঃপর শাইখ তায়েফ নগরীতে দারুত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইতোপূর্বে দামেস্কের বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ করে আল-কাআহ জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন।

শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র সঙ্গে সম্পর্ক

একই যুগে, একই জনপদে এই দুই মহান ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন।

রচনাবলী

শাইখ আল্লামা বাহজাহ আল-বায়তার (রাহিমাহুল্লা-হ) অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় লিখেন, পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু মহামূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো– **১.** ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লা-হ) কর্তৃক প্রণীত মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ-এর উপর টীকা। **২.** ইবনুল আম্বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র গ্রন্থ আসরারুল আরাবিয়্যাহ-এর তাহ্ক্বীক্ব। **৩.** শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র জীবনী। **৪.** ইসলাম ও সাহাবায়ে কিরাম : শী'আহ্-সুন্নীর দৃষ্টিকোণ হতে। **৫.** দু'টি সংস্কৃতি, নীল ও সাদা প্রভৃতি।

ইন্তেকাল

আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বায়তার ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, ১৩৯৬ হিজরি সনে দামেস্কে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে 'ইল্‌ম ও দাওয়াতের জগত হতে এ মহান জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের পতন ঘটে। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস দ্বারা সম্মানিত করুন। ❑

১৭ই রামাযান : মহান আল্লাহর রহমতে সিক্ত বদরের ময়দান

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

মুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিঃশ্বেষ করার যে অভিপ্রায় নিয়ে নকশা আঁকতে লাগলো মক্কার কাফেররা। এক মহান আল্লাহর একত্ববাদের সত্তাকে স্তিমিত করতে তারা কৌশল আঁটে। গোত্রে, গোত্রে, লাত-মানাতের দোহাই দিয়ে যুদ্ধের সংবাদ পাঠায়। তখন মদিনায় সাড়া পড়ে যায়। এক মহান আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার তাগুতি শক্তির থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের ঘোষণা দেন মহানবী (ﷺ)। মদিনার গলিতে গলিতে তখন উৎসব। নিজেকে মহান আল্লাহর সম্মুখে উৎসর্গ করার মোক্ষম সুযোগ পেল সৌভাগ্যবানরা। শহীদের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল এক একটি মন। অন্তরে জেগে ওঠে এলাহি প্রেম। খুশি হন প্রভু। বাহ্যত দুর্বল, ক্ষীণকায় সবদিকে পেছানো মুসলমানদের ঈমানের জ্যোতির কারণে মহান মালিক ঘোষণা দেন তাদের বিজয়ের। ঘোষণা দেন আসমান থেকে ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে সাহায্যের। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

"স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তখন তিনি তোমাদের জবাব দিয়েছিলেন– 'আমি তোমাদের সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেশ্‌তা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে'।"[৮১]

একই মর্মে তিনি বলেছেন,

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُنزَلِينَ ○ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾

"স্মরণ করো, যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে– 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সহায়তা করবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয় যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সাবধান হয়ে চলো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"[৮২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আকুল প্রার্থনা

বদরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৈন্যদের শ্রেণিবিন্যাস কার্য শেষ করে ফিরে এসেই স্বীয় মহান প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল–

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِيْ مَا وَعَدْتَّنِيْ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূর্ণকরণের প্রার্থনা করছি।"

অতঃপর যখন উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন তিনি এ প্রার্থনা করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكَ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَاتُعْبَدُ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ اَبَدًا.

অর্থ : "হে আল্লাহ! এ দলটিকে যদি আজ তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে তোমার আর উপাসনা করা হবে না। হে আল্লাহ! তুমি যদি এটাই চাও তবে আজকের পরে তোমার আর কখনো 'ইবাদত করা হবে না।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করলেন এবং তিনি এমন আত্মভোলো হয়ে পড়লেন যে, তাঁর চাদরখানা তাঁর স্কন্ধদেশ হতে খুলে গেল। তখনও তিনি পূর্বের ন্যায় প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকলেন। এদৃশ্য দেখে আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অধীরভাবে ছুটে আসলেন এবং চাদরখানা দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করতঃ তাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! যথেষ্ট হয়েছে। বড়োই কাতর কণ্ঠে আপনি প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছেন। এ প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। শিগগিরই

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৮১] *সূরা আল আনফাল : ৯।*

[৮২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১২৪-১২৫।*

তিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করবেন।" এদিকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে ওহী করলেন–

﴿اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾

অর্থ : "আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। সুতরাং মু'মিনদেরকে অবিচলিত রাখো, যারা কুফ্রী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো।"[৮৩]

আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন–

﴿اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ﴾

অর্থ : "আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক সহস্র ফেরেশ্তা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।"[৮৪]

ফেরেশ্তাদের অবতরণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মুষ্টি পাথরে মাটি নিলেন এবং কুরাইশদের দিকে মুখ করে বললেন, شَاهَتِ الْوُجُوْهُ "চেহারাগুলো বিকৃত হোক।" আর একথা বলার সাথে সাথেই ঐ মাটি তাদের চেহারার দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মুশরিকদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যার চক্ষুদ্বয়ে, নাকে মুখে ঐ এক মুষ্টি মাটির কিছু না কিছু অংশ পতিত হয়নি। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى﴾

অর্থ : "তুমি যখন মাটি নিক্ষেপ করেছিলে তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।"[৮৫]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বদরের যুদ্ধে ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধে ফেরেশ্তারা যোগদান করেননি।[৮৬]

উল্লেখ্য যে, সূরা আল আনফাল-এর ৯ নং আয়াতে 'এক হাজার', আ-লি 'ইমরান-এর ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে যথাক্রমে 'তিন হাজার' ও 'পাঁচ হাজার' ফেরেশ্তা অবতরণের কথা বলা হয়েছে'। এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এক হাজার' সংখ্যাটি তিন হাজার বা তার অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। কেননা, উক্ত আয়াতের শেষে مُرْدِفِيْنَ শব্দ এসেছে। যার অর্থ 'ধারাবাহিকভাবে আগত'। অতএব, মহান আল্লাহর হুকুমে যত হাজার প্রয়োজন, তত হাজার ফেরেশ্তা নাযিল হবে'।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি জেগে উঠে বললেন,

أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ، هَذَا جِبْرِيْلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ.

'সুসংবাদ গ্রহণ করো হে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! তোমার কাছে মহান আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই যে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম), তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন'।[৮৭]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় এসেছে– তিনি বলেন,

هَذَا جِبْرِيْلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

'ঐ যে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।' অতঃপর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে বললেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ.

'সত্বর দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে।'[৮৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বাইরে এসে আঙ্গুলের ইশারা করে করে বলেন,

هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ.

'এটি অমুকের বধ্যভূমি। এটি অমুকের, ওটি অমুকের।'

রাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাদের কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে যেখানে মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইশারা করেছিলেন।[৮৯]

আবূ দাউদ আল-মাযেনী বলেন, আমি একজন মুশরিক সৈন্যকে মারতে উদ্যত হব। ইতিমধ্যে তার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে এসে পড়ল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কে ওকে মারল'। রাসূল (ﷺ)-এর চাচা 'আব্বাস যিনি

[৮৩] *সূরা আল আনফাল : ১২।*
[৮৪] *সূরা আল আনফাল : ৯।*
[৮৫] *সূরা আল আনফাল : ১৭।*
[৮৬] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[৮৭] *ফিক্বহুস সীরাহ- আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, ২২৫ পৃ., সনদ হাসান; ইবনু হিশাম- ১/৬২৬-২৭, সনদ 'মুরসাল'; তাহ্ক্বীক্ব : ইবনু হিশাম- ক্রমিক নং ৭৪৭।*
[৮৮] *সূরা আল ক্বামার : ৪৫; ইবনু হিশাম- ১/৬২৭; বুখারী- হা. ৩৯৫৩, ৩৯৯৫; মিশকাত- অধ্যায় : 'ফাযায়েল ও শামায়েল', মু'জিযাহ্, অনুচ্ছেদ– ৭ : সীরাহ, হা. ৫৮৭২-৭৩; সহীহাহ্- ২/৩৬৫ পৃ.।*
[৮৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৭৯ (৮৩); মিশকাত- হা. ৫৮৭১।*

বাহ্যিকভাবে মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন, জনৈক আনসার তাকে বন্দী করে আনলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি; বরং যে ব্যক্তি বন্দী করেছে, তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি একজন চুল বিহীন মাথাওয়ালা ও সুন্দর চেহারার মানুষ এবং বিচিত্র বর্ণের একটি সুন্দর ঘোড়ায় তিনি সওয়ার ছিলেন। আনসার যোদ্ধা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই এনাকে বন্দী করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত আনসারকে বললেন,

اَسْكُتْ فَقَدْ أَيَّدَكَ اللهُ بِمَلَكٍ كَرِيْمٍ.

'চুপ করো। আল্লাহ তা'আলা এক সম্মানিত ফেরেশ্তা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন।'[৯০]

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, ফেরেশ্তারা কোনো মুশরিকের উপরে আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।[৯১]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ঐ দিন একজন মুসলিম সেনা তার সম্মুখের মুশরিককে মারতে গেলে শাণিত তরবারির ও ঘোড়ার আওয়ায শুনেন। তিনি ফেরেশ্তার আওয়ায শুনেছেন যে, তিনি বলছেন أَقْدِمْ حَيْزُوْمُ 'হায়যূম আগে বাড়ো' ('হায়যূম' হলো ফেরেশ্তার ঘোড়ার নাম)। অতঃপর ঐ মুশরিক সেনাকে তিনি সামনে চিৎ হয়ে পড়ে যেতে দেখেন। তিনি দেখলেন যে, তরবারির আঘাতের ন্যায় তার নাক ও মুখমণ্ডল বিভক্ত হয়ে গেছে। উক্ত আনসার সাহাবী রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন,

صَدَقْتَ، ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ.

'তুমি সত্য বলেছ। ওটি তৃতীয় আসমান থেকে সরাসরি সাহায্যের অংশ।'[৯২]

কেউ কতক ফেরেশ্তাকে সরাসরি দেখেছেন। ঐদিন ফেরেশ্তাদের মাথার পাগড়ি ছিল সাদা। যা তাদের পিঠ পর্যন্ত ঝুলে ছিল। তবে জিবরাঈলের মাথার পাগড়ী ছিল হলুদ বর্ণের।[৯৩]

[৯০] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯৪৮।*
[৯১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯৪৮, সনদ সহীহ; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ- হা. ৩৬৬৭৯।*
[৯২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৬৩ (৫৮); মিশকাত- হা. ৫৮৭৪।*
[৯৩] *সীরাতে ইবনু হিশাম- ১/৬৩৩।*

ময়দান হতে ইবলীসের পলায়ন

অভিশপ্ত ইবলিস সোরাকা ইবনু মালেক ইবনু জুশুম মুদলিজীর সুরতে এসেছিল এবং এতক্ষণ পর্যন্তও সে মুশরিকগণ হতে পৃথক হয়নি। কিন্তু যখন সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশ্তাগণের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল, তখন সে পেছনে ফিরে পলায়ন করতে থাকলো। কিন্তু হারেস ইবনু হিশাম তাকে আটকিয়ে রাখলেন। তার বিশ্বাস যে সে প্রকৃতই সোরাকা। কিন্তু ইবলীস তার বুকে এত জোরে ঘুষি মারল যে, সে মাটিতে পড়ে গেল। ইত্যবসরে ইবলিস সেখান থেকে পলায়ন করল। মুশরিকগণ বলতে লাগল, "সোরাকা কোথায় যাচ্ছে? তুমি কি বলোনি যে তুমি আমাদের সাহায্য করবে, কখনই আমাদের থেকে পৃথক হবে না?"

সে বলল, "আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছ না। মহান আল্লাহকে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তিনি কঠিন শাস্তির মালিক।" এরপর পলায়ন করে সে সমুদ্রের ভেতরে যেতে থাকল।

মহান আল্লাহর সাহায্যের কাছে পার্থিব সব শক্তিই যে নিঃস্ব। সত্য ও পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামের বিজয় হবেই। তারা যে এক মহান আল্লাহর উপাসনা করে। 'ইবাদত করে একজনেরই। তাদের আল্লাহ তা'আলা এক। তিনি আদি অনন্ত। কোনো শরীক বা অংশীদার তার নেই। তাই তিনি এই সত্যাশ্রয়ীদেরকেই জয়ী করলেন। তার ওয়াদা পূর্ণ করে সূচিত হয় মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিজয়। জয়লাভ করে বদর যুদ্ধে। বদর যুদ্ধ শুধু নিছক দু'টি দলের যুদ্ধই নয়; বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত কার সময়ের জন্য সত্য-মিথ্যার ক্ষেত্রে মানবজাতিকে অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে যাবে। এটাও মহান আল্লাহর রহমতেরই ভিন্ন দিক। এ যুদ্ধে গোটা মানবগোষ্ঠীকে আল্লাহ তা'আলা দু'ভাগে বিভক্ত করে দেন এবং পুনরায় উভয়ের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন।

বদর যুদ্ধের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত হলো এবং তার বিস্তৃতির দ্বার উন্মুক্ত হলো। অন্য তাগুতী রাষ্ট্রসমূহের পতনের পালা শুরু হলো এবং কালক্রমে হিংসা-বিদ্বেষ জুলুম-শোষণ, কলহ-বিবাদ ও মানবতা-মনুষ্যত্বের বিনাশ সাধনকারী ব্যর্থ রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত করে ইসলাম অর্ধ পৃথিবীব্যাপী এক আলোকিত সমাজ মানবজাতিকে উপহার দেয়া হলো। ❑

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

মধ্য রামাযানে ইমাম মাহদীর আগমন ও পূর্ব আকাশে বিকট শব্দ প্রসঙ্গ

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : সাবধান! ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে কোনো এক রামযান মাসের মাঝামাঝিতে আকাশ থেকে বিকট আওয়াজ আসবে, তারপর সত্তর হাজার মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে, সত্তর হাজার মানুষ বধির হয়ে যাবে– এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল মতান্তরে বানোয়াট ও বাতিল বলে গণ্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে কতিপয় তথাকথিত বক্তা বা আলেম ইমাম মাহদী সম্পর্কে বহু জাল, যঈফ বর্ণনা এবং বিভিন্ন কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে সাধারণ মানুষের মাঝে নানা বিভ্রান্তি ও ভয়ভীতি সঞ্চার করে চলেছেন। আর এসব শুনে অনেক মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

এ কথা চূড়ান্ত সত্য যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী আসবেন এবং ন্যায়-নীতি ও ইনসাফভিত্তিক বিশ্ব শাসন করবেন, তখন পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে– এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।

এরপরও কতিপয় তথাকথিত আলেম ওয়াজের মাঠের দখলদারিত্ব ও শ্রোতা বাড়াতে এবং আমিত্ব প্রচারের জন্য বিভিন্ন জাল-যঈফ বর্ণনার পাশাপাশি অতি উৎসাহী হয়ে ইমাম মাহদী সম্পর্কেও বানোয়াট ও জাল-যঈফ হাদীস বর্ণনা করছেন। তাঁর আগমনের সম্ভাব্য সনও নির্দিষ্ট করে বলছেন, তাকে স্বপ্নে দেখেছেন বলে মিথ্যাচার করছেন। কেউ কেউ আরো একটু অগ্রগামী হয়ে বলছেন, ইতোমধ্যে তিনি এসে গেছেন, তাঁর জন্ম হয়ে গেছে, অমুক দেশে এক ব্যক্তির মাঝে এত পারসেন্ট আলামত মিলে গেছে– এসব গালগল্প, মিথ্যাচার ও অতিরঞ্জন কোনোভাবেই কাম্য নয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

যাহোক, এবার আসি, কথিত হাদীস সম্পর্কে। ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। বিজ্ঞ হাদীস বিশারগদণের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত দুর্বল, বাতিল ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে চিহ্নিত।

নিম্নে মূল হাদীসটির আরবী টেক্সট, তরজমা, উৎস এবং এ সম্পর্কে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মতামত ও বক্তব্য তুলে ধরা হলো– হাদীসটি নিম্নরূপ :

ফিরোজ দায়লামি হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ صَوْتٌ، قَالُوْا : فِيْ أَوَّلِهِ أَوْ فِيْ وَسَطِهِ أَوْ فِيْ آخِرِهِ؟ قَالَ : لَا؛ بَلْ فِيْ النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ يَكُوْنُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَيُخْرَسُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَيُعْمَى سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَيُصِمُّ سَبْعُوْنَ أَلْفًا. قَالُوْا : فَمَنِ السَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ : مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُوْدِ، وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ لِلّٰهِ. ثُمَّ يَتْبَعُهُ صَوْتٌ آخَرُ. وَالصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جِبْرِيلَ، وَالثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانِ. فَالصَّوْتُ فِيْ رَمَضَانَ، وَالمَعْمَعَةُ فِيْ شَوَّالٍ، وَتُمَيَّزُ الْقَبَائِلُ فِيْ ذِيْ الْقَعْدَةِ ، وَيُغَارُ عَلَى الْحُجَّاجِ فِيْ ذِيْ الْحِجَّةِ، وَفِيْ الْمُحَرَّمِ، وَمَا الْمُحَرَّمُ؟ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ عَلَى أُمَّتِيْ، وَآخِرُهُ فَرَجٌ لِأُمَّتِيْ، الرَّاحِلَةُ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ بِقَتَبِهَا يَنْجُوْ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ لَهُ مِنْ دَسْكَرَةٍ تَغُلُّ مِائَةَ أَلْفٍ.

কোনো এক রামাযানে আওয়াজ আসবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রামাযানের শুরুতে, নাকি মাঝামাঝি সময়ে, নাকি শেষ দিকে? নবী ﷺ বললেন, না!; বরং রামাযানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রামাযানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মাতের মধ্যে কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে? নবী ﷺ বললেন, যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সাজদায় লুটিয়ে আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চ শব্দে আল্লাহু আকবর বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। (ঘটনার পরম্পরা এরূপ) :

শব্দ আসবে রামাযানে। ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জুলক্বা‘দ মাসে। হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে যিলহাজ্জ মাসে। আর মুহর্‌রমের শুরুটা আমার উম্মাতের জন্য বিপদ এবং শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলিম যে বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে এক লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[৯৪]

এ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত

শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হাদীসটি مَوْضُوْع বা বানোয়াট। ইবনুল জাওযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর আল মাউযু‘আত বা

[৯৪] *আল মু‘জামুল কাবীর লিত ত্বারানী।*

বানোয়াট হাদীস সংকলন গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।[৯৫] তিনি বলেন, هذا حديث لا يصح-এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ এর সনদে আব্দুল ওয়াহ্হাব নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ কঠোর আপত্তি করেছেন। যেমন- **ক)** উকাইলী বলেন, عبد الوهاب ليس بشيء "আব্দুল ওয়াহ্হাব কিছুই নয়।" (এ বাক্যটি দ্বারা বর্ণনাকারীর প্রতি কঠোর সমালোচনা বুঝায়।) **খ)** ইবনু হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, كان يسرق الحديث؛ لا يحل الاحتجاج به "সে হাদীস চুরি করতো। তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ নয়।" **গ)** দারাকুত্বনী বলেন, منكر الحديث মুনকারুল হাদীস। এছাড়াও সনদে আরও সমস্যা আছে।[৯৬] ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, باطل-এ হাদীসটি বাতিল।[৯৭]

হাইসামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাসূত্রে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনুয যাহ্হাক নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে মুহাদ্দিসীনদের দৃষ্টিতে মাতরূক বা পরিত্যাজ্য।[৯৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

في أحاديث لا تصح في التواريخ المستقبلية.

"অগ্রিম তারিখ নির্ধারণ করে বিভিন্ন ঘটনা ঘটার বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো সহীহ নয়।"

সে সব হাদীসের মধ্যে একটি হলো–

يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة جمعة، يصعق له سبعون ألفا، ويصم سبعون ألفا.

"অর্ধ রামাযানের জুমু'আর রাতে একটি আওয়াজ হবে। এতে সত্তর হাজার মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে, সত্তর হাজার মানুষ বোবা হয়ে যাবে...।"[৯৯]

পরিশেষে বলবো, আমাদের কর্তব্য, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মিথ্যা, বানোয়াট বা বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত নয় হাদীস থেকে সাবধান হওয়া। কেননা, বানোয়াট, জাল-যঈফ হাদীস দ্বারা ইসলামের লাভ হয় না; বরং ক্ষতি হয়। পরিণতিতে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, তার পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং হক্বের পথে অবিচল রাখুন –আমীন। *[গ্রন্থনা : এম. জি. রহমান]*

---

[৯৫] *আল মাউযূ'আত- ৩/১৯১।*
[৯৬] *শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সিলসিলা য'ঈফার ৬০৭৮ ও ৬০৭৯ নং হাদীস পর্যালোচনা থেকে সংক্ষেপিত।*
[৯৭] *তারতীবুল মাউযূ'আত- ২৭৮।*
[৯৮] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৭/৩১৩।*
[৯৯] *আল মানারুল মুনীফ- ৯৬ পৃ.।*

জমঈয়ত সংবাদ

[৩৭ পৃষ্ঠার পর]

যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া...

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষার্থী মুহাম্মদ আলী এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে পাঁচরুখী দারুল হাদীস সালাফিয়্যার শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের যথাক্রমে পাঁচ, চার ও তিন হাজার টাকা প্রদান করা হয়। বাকি মুমতাজ মুরতাফিদের ১ হাজার টাকা, মুমতাজ গায়ের মুরতাফিদের পাঁচশ টাকা, জাইয়্যিদ জিদ্দানদের তিনশ টাকা ও মাকবুলদের দুইশ টাকা প্রদান করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

১. পঞ্চগড় জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ রফীজুল হক গত ২৭ মার্চ সোমবার রাত (আনুমানিক) সাড়ে ৩টায় মৃত্যুবরণ করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আ ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

২. গাইবান্ধা জেলা মসজিদ কমিটির সেক্রেটারির পিতা আলহাজ্জ আব্দুর রহমান (৬৫) গত ২২ মার্চ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ১ মেয়ে এবং অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। তার জানাযায় জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারি অংশগ্রহণ করেন।

৩. কুপতলা আহলে হাদীস জামে মসজিদ শাখার সদস্য এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন গাইবান্ধা জেলার উচ্চমান অফিস সহকারী মো. রেজাউল করিম (৫৮) গত ১৮ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি পিতা-মাতা, ভাই বোন ও ১ ছেলে, ২ মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন জমঈয়ত হিতৈশী নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

৪. নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলাধীন পাজরভাঙ্গা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক-এর "মা" মোমেনা খাতুন ৩ এপ্রিল সোমবার সকাল ০৯টায় ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মাইয়্যিতের বাবা ছিলেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখ জমির উদ্দীন। নওগাঁ জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের মাগফিরাত প্রার্থনা করে সকল মুসলিমের নিকট দু'আর আবেদন জানান হয়েছে; আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেন জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করেন –আমীন।

সকল মুসলিমকে মাইয়্যিতগণের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রত্যাশায় মাগফিরাতের দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমাজচিন্তা

পহেলা বৈশাখ : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

–আবু লাবীবা★

"আলোয় ভুবন জাগলো যখন
নতুন বছর সুস্বাগতম।
নীড়ের পাখি, উঠলো ডাকি
পাখ পাখালির ডাক।
বছর বাদে আসলো ফিরে-
পয়লা এ বৈশাখ।"

পহেলা বৈশাখ বা পয়লা বৈশাখ (বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ) বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ বা رأس السنة البنغالية বা New Year's day বা বর্ষবরণ বা نيروز এই শব্দগুলো নতুন বছরের আগমন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠানাদিকে ইঙ্গিত করে। দিনটি সকল বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণের দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশে জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন লোকউৎসব হিসেবে বিবেচিত।[১০০] এতদুপলক্ষ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, হাসিঠাট্টা ও আনন্দ উপভোগ, সাজগোজ করে নারীদের অবাধ বিচরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী, রাতে অভিজাত এলাকার ক্লাব ইত্যাদিতে মদ্যপান তথা নাচানাচি, পটকা ফুটানো, শাখা-সিঁদুরের রঙে (সাদা ও লাল) পোশাক পরিধান, বিয়ের মিথ্যা সাজে দম্পত্তি সাজিয়ে বর-কনের শোভাযাত্রা, মূর্তির (কুমির, পেঁচা, বাঘ ইত্যাদিও মুখোশ) প্রদর্শনী, উল্কি আঁকা, মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করছে। নববর্ষ উদযাপনে তাদের আনন্দ-ফূর্তি ক্রমেই যেন সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। বাংলা নববর্ষের নামে পোত্তলিকতার প্রচার প্রসার করা হচ্ছে, আর বলা হচ্ছে এটাই নাকি বাংলার সংস্কৃতি!!! আজ থেকে ৩৬ বছর আগে তা এমন ছিল না। যদি এটা বাংলা সংস্কৃতি হয়, তাহলে ৩৫ বছর আগে কেন ছিল না?

আসল কথা হলো– মঙ্গল শোভাযাত্রা কোনোকালেই বাংলাদেশের বা বাঙালির ঐতিহ্য ছিল না; বরং এটা ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক কৌশলের অংশ মাত্র। যাকে সংস্কৃতির লেবাস পরিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ঢাকায় প্রথম চালু করা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা পুরোটাই হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ। কেননা, হিন্দু ধর্ম মতে, অসুরকে দমন করে দেবী-দুর্গা। আর মঙ্গল শোভাযাত্রায় অসুর থেকে মঙ্গল কামনা করা হয়। তাদের মতে, শ্রী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে। তাই হিন্দুরা অশুভ তাড়াতে শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিনে তথা জন্মাষ্টমীতে প্রতিবছর সারা দেশে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গের বরোদা আর্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্র তরুণ ঘোষ ১৯৮৯ সালে এদেশে চারুকলা ইন্সটিটিউটের কাঁধে ভর করে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর এটা চাপিয়ে দেয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়ে চারুকলা থেকে বের হওয়া ছাড়া এর অন্য কোনো উদাহরণ নেই। এখনও ধর্মনিরপেক্ষ ও কিছু গা ভাসানো লোক এবং মিডিয়া ও পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর জন্য তেমন কোনো আবেগ নেই। আর আবেগ হলেই সেটা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে, এমনটি নয়; বরং ইসলাম বৈরীদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াসমূহের বদৌলতে হিন্দুদের বহুবিধ পূজা এখন এদেশে বাঙালি সংস্কৃতি বলে চালানো হচ্ছে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সেসবেরই অন্যতম। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেব-দেবীদের বিভিন্ন বাহনের মূর্তিসমূহ নিয়ে এই শোভাযাত্রা হয়ে থাকে। যেমন গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, স্বরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর বাহন বা মঙ্গলের প্রতীক হলো পেঁচা, বিষ্ণুর বাহন ঈগল, দুর্গার বাহন সিংহ-বাঘ, মৃত্যু দেবীর বাহন মহিষ, শিবের বাহন ক্ষ্যাপা ষাঁড় ইত্যাদি সবই হিন্দুদের বিভিন্ন বিশ্বাসেরই উপাত্ত। হিন্দুধর্মের প্রধান সৌর দেবতা হলো সূর্য। শোভাযাত্রায় বহনকৃত সকল মুখোশ ও মূর্তিই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতীক। পক্ষান্তরে ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। এছাড়া প্রাচীনকালের ন্যায় শয়তানের উপাসনা কল্পনা করে রাক্ষস-খোক্কসের মুখোশ পরিধান করে সেগুলোকে খুশি করা হয়, যাতে শয়তান কোনো অমঙ্গল না ঘটায়। এই শোভাযাত্রায় এভাবে নতুন বছরে মঙ্গল কামনা করা হয়। সুতরাং এই পৌত্তলিক শোভাযাত্রা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ঈমান-'আক্বীদার বিরোধী, অসামঞ্জস্যপূর্ণ; কুফ্‌র ও শির্‌কে পরিপূর্ণ। বৈশাখ

★ *শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী মহানগর।*

[১০০] *[সমবারু চন্দ্র মহন্ত (২০১২)। "পহেলা বৈশাখ"। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)। ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।]*

বরণের নামে এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম সংস্কৃতির অংশ নয়; হতে পারে না। বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। কত মায়ের সন্তান যে মুশরিকত্ব বরণের উৎসবে আটকা পড়েছে। ধর্মহীনতার চোরাবালিতে তারা তলিয়ে যাচ্ছে। তা একটু ভেবে দেখা দরকার। কেননা, মুসলমানরা একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই মঙ্গল কামনা করেন ও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ করেন। তবে তিনি তো সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"[১০১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মহান আল্লাহর হাতেই সকল ক্ষমতা, আল্লাহই রাত ও দিন পরিবর্তন করেন।[১০২]

এর বিপরীত হলো শির্ক। যার পাপ আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করেন না। অথচ একদল বোকা মানুষ তথাকথিত একদল মূর্খের দল মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে মহান আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত হচ্ছে এবং অন্যকে শির্ক করাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন, আর তার বাসস্থান হবে অগ্নি এবং যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[১০৩]

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

"যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করো তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১০৪]

তাছাড়াও আমাদের এ জীবন নিছক আনন্দ-উল্লাস কিংবা ভোগ-বিলাসে কেটে দেয়ার জন্য নয়। এ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে এবং একদিন তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"জিন্ ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার 'ইবাদত করবে।"[১০৫]

আর উৎসব সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। উৎসবের উপলক্ষগুলো খোঁজ করলে পাওয়া যাবে উৎসব পালনকারী জাতির নিজ ধর্মীয় অনুভূতি, সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার ছোঁয়া। যেমন- খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন তাদের বিশ্বাসমতে স্রষ্টার পুত্রের জন্মদিন। মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হত ২৫শে মার্চ এবং তা পালনের উপলক্ষ ছিল এই যে, ঐ দিন খ্রিষ্টিয় মতবাদ অনুযায়ী মাতা মেরীর নিকট ঐশী বাণী প্রেরিত হয় এই মর্মে যে, মেরী ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দিতে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পহেলা জানুয়ারি নববর্ষ উদযাপন করা আরম্ভ করে। ঐতিহ্যগতভাবে এই দিনটি একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পালিত হত। ইহুদীদের নববর্ষ রোশ হাশানাহ ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ইহুদীদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত হিসেবে পালিত হয়। এমনিভাবে প্রায় সকল জাতির উৎসব-উপলক্ষের মাঝেই ধর্মীয় চিন্তা-ধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এজন্যই ইসলাম ধর্মে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) পরিষ্কারভাবে মুসলিমদের উৎসবকে নির্ধারণ করেছেন। ফলে অন্যদের উৎসব মুসলিমদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। নববর্ষ আরবি হোক, বা বাংলা হোক, বা ইংরেজি, তা পালন করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বানের বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (رضي الله عنه) বলেছেন,

من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি (অগ্নিপূজক) পারসিকদের দেশে গমন করে, অতঃপর তাদের নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজান (উৎসবের দিবস) পালন করে, আর তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং এ অবস্থাতেই মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার হাশ্র তাদের সাথেই হবে।"[১০৬]

২. সঊদি আরবের 'ইল্মী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটি (সৌদি ফাতাওয়া বোর্ড) প্রদত্ত ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে–

لا تجوز التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة، لأن الاحتفاء بها غير مشروع.

---

[১০১] *সূরা আল আন'আম : ১৭।*
[১০২] *সহীহুল বুখারী- ২য় খণ্ড, ৭১৫ পৃ.।*
[১০৩] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭২।*
[১০৪] *সূরা আয্ যুমার : ৬৫।*
[১০৫] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৬।*
[১০৬] *বাইহাক্বী- খণ্ড : ৯; পৃ. ২৩৪; গৃহীত : ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ), আহকামু আহলিয যিম্মাহ- পৃ. ১২৪৮; ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন।*

"হিজরি নববর্ষ উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ জানানো জায়িয নয়। কেননা, নববর্ষকে অভ্যর্থনা জানানো শরিয়তসম্মত নয়।"[১০৭]

৩. ইমাম সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ) প্রদত্ত ফাতাওয়া–

السؤال : إذا قال لي شخص كل عام وانتم بخير فهل هذه الكلمة مشروعة في هذه الأيام؟

প্রশ্ন : "যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে বলে, সকল বছরে আপনি ভালো থাকুন, তাহলে এই (নববর্ষের) দিনগুলোতে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা কি শরিয়তসম্মত হবে?"

الجواب : لا. ليست بمشروعة، ولا يجوز هذا.

উত্তর : "না, এই শব্দগুচ্ছ শরিয়তসম্মত নয়। এটি অবৈধ, না-জায়িয।"[১০৮]

৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

ليس من السنة أن نحدث عيدا لدخول السنة الهجرية أو نعتاد التهاني ببلوغه.

"হিজরি নববর্ষের আগমন উপলক্ষ্যে উৎসব করা কিংবা নববর্ষের দিবস উপলক্ষ্যে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানানোর রীতি চালু করা সুন্নাহ বহির্ভূত কর্ম।"[১০৯]

ইসলামী শরিয়ত মুসলিমদের জন্য স্রেফ দু'টি ঈদ (উৎসব) নির্ধারণ করেছে। তাই এই দুই উৎসব ব্যতীত অন্য কোনো উৎসব পালন করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা দু'টি দিন (নওরোজ ও মেহেরজান) খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই দু'টি দিন কীসের? তারা বলে, জাহেলি যুগে আমরা এই দুই দিন খেলাধুলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দু'টি উত্তম দিন দান করেছেন। আর তা হলো– ঈদুল আজহা (কোরবানীর ঈদ) এবং ঈদুল ফিত্বর (রোযার ঈদ)।"[১১০]

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে দু'টি দিবস নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যে দু'টি দিবসে তারা উৎসব পালন করবে। রাসূল (ﷺ) তো বলতে পারতেন যে, তোমাদের দুই দিন থাক। সাথে এই দু'টিও নাও। কিন্তু তিনি তা বলেননি। কারণ, ইসলাম এসেছে জাহেলিয়াতকে অপসৃত করতে। ইসলাম চায় জাহেলিয়াতের অপনোদন। ইসলাম আর জাহেলিয়াত কখনো এক হতে পারে না। এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের জীবনে এই দু'টি দিবস ছাড়া অন্য কোনো দিবস থাকতে পারে না। সুতরাং নববর্ষ পালন করা ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।[১১১]

নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি –এ ধরনের কোনো তত্ত্ব ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়; বরং নতুন বছরের সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতি-পূজারি মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার অবশিষ্ঠাংশ। ইসলামে এ ধরনের কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই; বরং মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম মূল্যবান হীরকখণ্ড। হয় সে এই মুহূর্তকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, নতুবা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। আর তাই তো ইসলামে হিজরি নববর্ষ পালনের কোনো প্রকার নির্দেশ দেয়া হয়নি। না কুরআনে এর কোনো নির্দেশ এসেছে, না হাদীসে এর প্রতি কোনো উৎসাহ দেয়া হয়েছে, না সাহাবীগণ এরূপ কোনো উপলক্ষ পালন করেছেন। এমনকি পহেলা মুহাররামকে নববর্ষের সূচনা হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় নবীজী (ﷺ)-এর মৃত্যুর বহু পরে, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমলে। এ থেকে বুঝা যায় যে, নববর্ষ ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যহীন, এর সাথে জীবনে কল্যাণ-অকল্যাণের গতিপ্রবাহের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। আর সেক্ষেত্রে ইংরেজি বা অন্য কোনো নববর্ষের কি-ই-বা তাৎপর্য থাকতে পারে ইসলামে?

কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, নববর্ষের প্রারম্ভের সাথে কল্যাণের কোনো সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শির্‌কে লিপ্ত হলো, অর্থাৎ- মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করল। যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উপলক্ষ্যের দ্বারা মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে সে ছোট শির্‌কে লিপ্ত হলো। আর কেউ যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের এই ক্ষণটি নিজে থেকেই কোনো কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড়ো শির্‌কে লিপ্ত হলো, যা তাকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে গেল। আর এই শির্‌ক

[১০৭] *লাজনাহ দাইমাহ- ফাতাওয়া নং- ২০৭৯৫; গৃহীত : ৎধযধন.হবঃ।*
[১০৮] *আল ইজাবাতুল মুহিম্মাহ- পৃ. ২৩০; গৃহীত : ৎধযধন.হবঃ।*
[১০৯] *দ্ব-দ্বিয়াউল লামি- পৃ. ৭০২; গৃহীত : ৎধযধন.হবঃ।*
[১১০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১১৩৪; সনদ : সাহীহ।*
[১১১] *শারহু সুনানিন নাসায়ী (যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতাবা)- ইমাম মুহাম্মাদ বিন 'আলী বিন আদাম আল-আসয়ূবী (হাফিযাহুল্লা-হ), খণ্ড : ১৭; পৃ. ১৫৩-১৫৪; দারু আলি বারূম, মক্কা কর্তৃক প্রকাশিত; সন : ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি. (১ম প্রকাশ)।*

এমন অপরাধ যে, শির্কের ওপর কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতকে চিরতরে হারাম করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গলময়তার এই ধারণার সম্পর্ক রয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্রে দাবি করা হয়, যা কিনা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। মুসলিমদেরকে এ ধরনের কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে ইসলামের যে মূলতত্ত্ব : সেই তাওহীদ বা একত্ববাদের ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ইসলাম ধর্ম ব্যতীত বর্তমান যুগে যত ধর্ম আছে, সব বাতিল ধর্ম। এগুলো মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে না; বরং মহান আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইহুদি হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।"[১১২]

নবী (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মাহর একটি দল মহান আল্লাহর শত্রু ইহুদি-খ্রিষ্টানের অনুসরণ করবে। যেমন- আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন,

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ.

"অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকেদের রীতিনীতি বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা? তিনি বললেন, তবে আর কারা?"[১১৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أُمَّتِيْ مَا أَتٰى عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتٰى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ.

"বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাহও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন- একজোড়া জুতোর একটি অপরটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মাহর মধ্যেও কেউ তাই করবে।"[১১৪]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে নববর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মুসলিম যুবক যুবতীরা হিন্দু/খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করছে। এমনকি তথাকথিত সুশীল সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরাও এ থেকে পিছিয়ে নেই। ওয়াল্লাহুল মুস্তাআন।

প্রতিটি পরিবারের প্রধানের এ বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত যে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন নববর্ষের কোনো অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। আপনার সচেতনতার অভাবে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হয় তবে আপনি ব্যর্থ অভিভাবক। জেনে রাখুন! রাসূল [ﷺ] বলেছেন,

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১১৫]

প্রিয় তরুণ-তরুণী ভাইবোন! নিজেকে অবমূল্যায়ন করবেন না। আপনার মতো যুবকের হাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। আপনার মতো তরুণীরা কত পুরুষকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছে। আপনার বয়সে মুসআব ইবনু উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গিয়েছেন ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হতে। সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই আমরা সচেতন হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন এবং কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী (ﷺ)-এঁর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

"এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আসমান ও জমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।"[১১৬]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন –আমীন। ❑

---

[১১২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩।*
[১১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩২০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৬৯।*
[১১৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৪১; সনদ : হাসান।*
[১১৫] *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত- হা. ৩৬৮৫।*
[১১৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৩।*

নিভৃত ভাবনা

ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা নৈতিকতার অবক্ষয়

–মো. আরিফুর রহমান*

সম্প্রতি বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একটা ঘটনা নিয়ে তুলকালাম ঘটে গেছে। আপনারা অনেকেই ঘটনাটা শুনেছেন বা সেই সম্পর্কে পড়েছেন। বগুড়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারকের মেয়ে পড়ে ঐ স্কুলে। আসুন জেনে নিই ঘটনাটা আর একবার–

শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী নিজেদের ক্লাসরুম ঝাড়ু দিতে হয় ক্লাস রোল অনুযায়ী পালাক্রমে। কিন্তু বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুবাইয়া ইয়াসমিনের ৮ম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে অন্যদের মতো ক্লাসরুম ঝাড়ু দিতে না চাইলে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ায় তারা।

পরে বাড়ি ফিরে ২০ মার্চ ২০২৩ রোজ সোমবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক স্টোরিতে সহপাঠীদের কটাক্ষ করে একটি পোস্ট শেয়ার করে ঐ বিচারকের মেয়ে। রোমান হরপে বাংলা ভাষায় লেখা ছিল পোস্টটি। আমাদের ভাষায় দেখে নেওয়া যাক সেটি, **"স্কুলের যেই বস্তিগুলা ঝাড়ু দিইনাই বলছিলি আমি জাজের মেয়ে দেখে ভাব দেখাই হো দেখাই আমার মা জাজ আমি ভাব দেখাবো না তো কে দেখাবে? পারলে তোর মাকেও জাজ হয়ে দেখাতে বল আইছে বস্তি।"**

এতে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের 'বস্তি' হিসেবে উল্লেখ করে নিজে বিচারকের মেয়ে তাই অন্যদের মতো সব নিয়ম তার জন্য নয় উল্লেখ করে আরো লেখা হয়, তার মতো সুবিধা পেতে হলে সবার মাকেও 'জাজ' হতে হবে! এমন আপত্তিকর পোস্ট দেখে তার কয়েকজন সহপাঠী পাল্টা কমেন্টে প্রতিবাদ জানায়।

এ নিয়ে বিচারক রুবাইয়া ইয়াসমিন বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুনকে মঙ্গলবার অভিভাবকদের ডাকতে বলেন। পরে মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে প্রধান শিক্ষিকার ডাকে অভিভাবকসহ ওই ৪ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে। ওই সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন বিচারক। এ সময় দুই অভিভাবককে ওই বিচারকের পা ধরে ক্ষমা চাইয়ে নেয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। তারপর থেকেই শিশু শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম ছেড়ে এ ঘটনার বিচার চেয়ে সড়ক অবরোধ করে।

আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী বলে, 'ওই মেয়ে আমাদেরকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করেছে। নিজে বিচারকের মেয়ে বলে সে ঝাড়ু দিতে পারবে না, আর আমরা নাকি বস্তির মেয়ে। এই ধরনের কথা সহপাঠীদের কী করে বলতে পারে! আর স্কুল পরিষ্কার করাটা তো আমাদের এখানে নিয়ম। শুধু আমাদের ক্লাসে নয়, সব ক্লাসের ছাত্রীরাই এ কাজ করে।'

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে থাকে। গত ২০ মার্চ ২০২৩ সোমবার ঐ শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষ ঝাড়ু দেয়ার কথা থাকলেও নিজেকে বিচারকের মেয়ে পরিচয় দিয়ে সে শ্রেণিকক্ষ ঝাড়ু দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে তার অপর সহপাঠীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতবিতণ্ডা হয়। পরদিন শ্রেণি শিক্ষককে বিষয়টি জানাতে চাইলেও তার আগেই আপত্তিকর স্টোরি পোস্ট করে মেয়েটি। এ বিষয়ে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন বলেন, 'বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। সরকারি চাকরিজীবীদের সন্তানদের সঙ্গে বেসরকারি চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীদের সন্তানদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কাজ করে।' তবে ঘটনার সময় প্রধান শিক্ষিকা নিজেও বিচারক রুবাইয়া ইয়াসমিনের পক্ষ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ করে ছাত্রীরা। এমনকি তাদের স্কুল থেকে বহিষ্কারের হুমকিও দেয়া হয় বলে দাবি তাদের।

বিচারক রুবাইয়া ইয়াসমিনকে স্কুলে এসে ক্ষমা চাওয়ার দাবি নিয়ে মঙ্গলবার দুপুর একটা থেকে সড়ক অবরোধ করে রাখে বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার যোগাযোগ করা হলেও রাত দশটা নাগাদ শিশুদের থামাতে বিচার বিভাগের কেউই আসেননি স্কুলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বগুড়া জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলাম ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে শিক্ষার্থীদের সড়ক থেকে স্কুলের অডিটরিয়ামে নিয়ে আসেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা তার আশ্বাসে বাড়ি ফেরে।

এখানে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিচারকের মেয়ে এই শিশুকাল থেকেই একটা অহংবোধ নিয়ে বড় হচ্ছে। আপনারা চিন্তা করেন-নিজের সহপাঠীদের সাথে কেমন আচরণ করলো মেয়েটি? ক্লাসরুমের ঘটনাটি

*প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও ছড়িয়ে দিল। তার ভাষা লক্ষ্য করেছেন? 'বস্তিগুলা' অর্থাৎ- তার সহপাঠীরা বস্তির মেয়ে। বিচারকের মেয়ের সহপাঠীরা এই বিষয়টি নিয়ে ফেইসকবুকে কমেন্ট করে। এই কমেন্ট এর জেরে বিচারক স্কুলে এসে কমেন্টকারী মেয়েদের অভিভাবকদের কয়েকজনকে প্রধানশিক্ষক এর মাধ্যমে স্কুলে ডেকে পাঠান। তারপর 'ডিজিটাল নিরাপত্তা' আইনে মামলা করার হুমকি দেন। তার মানে কী? ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কি ক্ষমতাবানদের রক্ষা করার হাতিয়ার? অসহায়দের অত্যাচার করার হাতিয়ার? রাষ্ট্রের একটা আইন একজন বিচারক কীভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার হুমকি দিতে পারে? তার নীতি নৈতিকতা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? একজন প্রধান শিক্ষক কি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন? নাকি বিচারকের ভয়ে তিনিও পক্ষপাতিত্ব করেছেন ক্ষমতাবানদের পক্ষে? এই ঘটনার শাস্তি শুধু বিচারককে প্রত্যাহার নয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ ﷺ এর পাশে থেকেছেন অসহায় সাহাবি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-বৃন্দ। কই কখনো তো তিনি গরিব ধনী পার্থক্য তো করেননি? দেখুন, সেকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মানুষ 'উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পাশে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মতো হাবসি দাস সালাত আদায় করেছেন। কই কখনো সেখানে অহংবোধের সৃষ্টি হয়নি? অহংকার তো আল্লাহর ভূষণ। শয়তান ইবলিস বলেছিল, আমি আগুনের তৈরি, মাটির তৈরি আদমকে কেন সাজদাহ্ করবো? বিষয়টি এমন নয় কি-যে আমি জাজের মেয়ে কেন ঝাড়ু দিবো শ্রেণিকক্ষ?

এই অহংকার, ধনী-গরিবের মনোভাব থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের শিক্ষাকারিকুলাম সেকুলারদের দখলে চলে গেছে। এখন আর ধর্মীয় জায়গা থেকে নীতিনৈতিকতার গল্প বা উপদেশ দিয়ে শিশুদের শেখানো হচ্ছে না। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে পাঠ্যবই সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। পর্দা ও ধর্মের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে একদল লেখক-গবেষক। নীতি নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ যদি না থাকে লেখাপড়া শিখে কী হবে এই জাতির?

শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রমে বাবা মায়ের সংখ্যা। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে অসহিষ্ণু মানুষের সংখ্যা। শুধু তাই নয়, আপনারা দেখেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রংপুরে জেলা প্রশাসককে 'আপা' বলায় তার ভিতর জেন্ডার চেতনা ধাক্কা দিয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, এই চেয়ারে কোনো পুরুষ বসলে কী বলতেন? শিক্ষক বলেছেন, সারভেন্ট অব দ্য স্টেট। কেন জেলা প্রশাসককে 'স্যার' ডাকেননি তা নিয়ে আর এক কাণ্ড। বিভিন্ন সময় এ সব ঘটনা আমাদের সামনে আসে। শুধু গণিত, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানই যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হয় তবে ধর্মীয় জ্ঞান কেন সেখানে সংযুক্ত করা হবে না? কেন নৈতিকতার চর্চাকে প্রমোট করা হচ্ছে না? আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সরকারি নিয়োগে মেধা যাচাইয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশীলন তার মধ্যে কেমন তাও যাচাই করার সময় এসেছে। একজন বড় কর্মকর্তা বা ছোটো কর্মকর্তা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে তা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এদেরকে জানতে হবে আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়। ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে এ জাতি কখনো প্রত্যাশিত রাষ্ট্র গড়তে পারবে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চা ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। এ জন্য শিক্ষা কারিকুলামে সহজীকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। এর পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উদাহারণ তুলে ধরতে হবে। শ্রেণিকক্ষই হোক নৈতিকতা, একসাথে কাজ করা, নিজের কাজ নিজেই করি-এর দৃষ্টান্ত।

বগুড়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা পালাক্রমে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করে এটা সমস্ত বাংলাদেশের স্কুলের জন্য আদর্শ হোক। বাংলাদেশের কোনো স্কুলে ওই বিচারপতির মতো কেউ যেন স্কুলে এসে কোনো অভিভাবককে শাসাতে না পারে সেই দায় স্কুলের। স্কুলগুলোকে শক্তিশালী করুন! স্কুলে একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কোনো নেতা যেন ফালতু খবরদারি না করতে পারে সেই ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে। স্কুলগুলোর ক্লাসরুম যদি ধর্মীয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুশীলনের জায়গা বানানো যায় তবে এ দেশে 'স্যার' না ডাকলে এক হাত দেখে নেবার মতো জেলা প্রশাসক তৈরি হবে না। স্কুলগুলো থেকেই যদি নৈতিকতার চর্চা শেখা যায় তবে নিজ দম্ভকে টিকিয়ে রাখতে নিজ মেয়ের সহপাঠীদের অভিভাবকদের হুমকি ধামকি দেয়ার মতো বিচারক তৈরি হবে না।

সরকারের পাশাপাশি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে দলমত নির্বিশেষে আমাদের দেশের স্কুলগুলো শক্তিশালী করার জন্য কাজ করা দরকার। ❑

মহিলাজগৎ

“মা” পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজনই

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

এই পৃথিবীতে আসার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আমাদের পিতা-মাতা। মায়ের উদর হতে জন্ম নিয়ে দুনিয়া নামক এই পৃথিবীতে আসার পরে বালেগ হওয়া পর্যন্ত আমাদের লালন পালনের দায়িত্ব একমাত্র পিতা-মাতাই গ্রহণ করেন। অপরদিকে এই বিশ্বের সকল সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব পুরোটাই পালন করেন সেই আল্লাহই। যে কারণেই তাকে “রাব্বুল ‘আলামীন’ তথা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক বলা হয়। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা শুধুমাত্র তার সন্তানের বাহ্যিক লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য আল্লাহর প্রতি ‘ইবাদত-বন্দেগী করার সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারেরও নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা‘আলা। যার বহু প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে আছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন :

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

অর্থ : “তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত কারো ‘ইবাদত করো না ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। তাদের উভয়ের সাথে মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনত করে দাও এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন পালন করেছিলেন।”[১১৭] অনুরূপ আল্লাহ বলেন :

﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

অর্থ : “তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত করো ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করো।”[১১৮]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর অর্থ স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র তাঁরই ‘ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের প্রত্যেক স্থানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের হক্বের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সৎ ব্যবহার পাওয়ার হক্বদার তথা পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে অসংখ্য আয়াতে এরূপ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন : “মহান আল্লাহর ‘ইবাদতের পর পিতা-মাতার হক্বের কথা।”[১১৯]

তিনি বলেছেন : “কবীরাহ গুনাহ হলো মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।”

পিতা-মাতার মধ্যে যদি দু’জনই বা একজনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। তাদের খিদমত করতে হবে এবং তাদের কথায় বা আচরণে কষ্ট পেয়ে মুখ দিয়ে “উফ্” শব্দটিও উচ্চারণ করা যাবে না। এমনকি ধমকের স্বরেও কথা বলা যাবে না। এ সময় তারা বেশি সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে খিদমতের জন্য। কারণ, নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলাফেরা করতে পারে না। ঔষধসহ নানা বিষয়ের প্রয়োজন হয়, কাপড় নষ্ট করে ফেলে ইত্যাদি। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন এ সময়টির কথা বেশি উল্লেখ করেছেন। এক কথায় তাদের সাথে সদা-সর্বদা উত্তম ভাষায় সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। রাসূল (ﷺ)-এর ভাষায় পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের জান্নাতে এবং জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম। কারণ, সন্তানদের ব্যবহারে পিতা-মাতা কষ্ট পেলে আল্লাহ তা‘আলা কষ্ট পান আর সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তা‘আলাই সন্তুষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। হাদীসটিতে বলা হয়েছে–

“রাসূল (ﷺ) একদিন মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবাহ্ দিতে যেয়ে তিনবার আমীন বললে সাহাবারা এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (ﷺ) বললেন– আমার নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যার নিকট আমার নাম স্মরণ করার পর আমার উপর দরুদ পাঠ করে না, বলুন আমীন, তখন আমি বললাম আমীন। আবার বললেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক যার কাছে রামাযান মাস এসে চলেও গেছে কিন্তু তার গুনাহসমূহ মাফ হয়নি, বলুন আমীন। আমি বললাম আমীন। পরিশেষে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আবারও বললেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক যে, তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের

---

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[১১৭] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ২৩-২৪।*

[১১৮] *সূরা আন্ নিসা : ৩৬।*

[১১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৭০; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭।*

একজনকে জীবিত পেয়েও জান্নাতে যেতে পারল না। বলুন, আমীন। আমি বললাম, আমীন।"[১২০]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! এখন প্রশ্ন হচ্ছে– পিতা-মাতা দু'জনই আমাদের নিকট পরম প্রয়োজনীয় কিন্তু দু'জনের মধ্যে কার হক্ব সবচেয়ে বেশি? কে বেশি আনুগত্য পাওয়ার হক্বদার? বাস্তবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় "মা"ই সন্তানের আনুগত্য, ভালোবাসা, সম্মান পাওয়ার বেশি হক্বদার। কিন্তু কুরআন এবং হাদীসের ভাষায় কে হক্বদার বেশি সেটিই এখন দেখার বিষয়। এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাক পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾

অর্থ : "আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভধারণ করেছে, কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং তাকে পেটে বহন করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে তারপর যখন সে পূর্ণ যৌবন লাভ করল এবং চল্লিশ বছরে পড়ল, তখন সে বলল : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক্ব দিন, যেন আমি এ সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি এমন সৎ 'আমল করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার সন্তানদেরকেও আমার জন্য সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনার নিকট তাওবাহ্ করছি এবং আপনার অনুগত বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।"[১২১]

অত্র আয়াতের অর্থের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ আরো বেশি জোরালো করার লক্ষ্যে বিশেষ করে মায়ের গর্ভকালীন দুঃখ কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'মা' সদ্ব্যবহার পাবার বেশি হক্বদার। কারণ, একটানা দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত গর্ভধারনের কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট এবং দুধ পান করানোর এবং তার খাওয়া-দাওয়াসহ চলাফেরার কষ্ট একমাত্র মা-ই সহ্য করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পিতার কোনো অংশ থাকে না। তাই রাসূল (ﷺ) এদিকে ইঙ্গিত করে এক সাহাবীর প্রশ্নের জবাবে বলেন, তোমার মা-ই বেশি হক্বদার সদাচরণ পাওয়ার। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুসারে রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো– "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার হক্বদার কে? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি আবার উত্তরে বললেন, তোমার মা। এরপর চতুর্থবার জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল (ﷺ) এবার উত্তরে বললেন, তোমার পিতা।"[১২২]

উক্ত হাদীস অনুযায়ী মা-ই সবচেয়ে বেশি সেবা-যত্ন, আদর, সম্মান পাওয়ার হক্বদার বেশি তার সন্তানের নিকট হতে। অপরপক্ষে সন্তানের প্রতিও মায়ের ভালোবাসা, আদর, স্নেহ তুলনাহীন। পৃথিবীতে মা, যে একমাত্র মা-ই যার সমতুল্য একজনও নেই। তার দু'আ যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এত দ্রুত কার্যকরী করে যা কল্পনাও করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল-এর মায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

সম্ভ্রান্ত এক নারীর সাথে বিয়ে হয় ইসমাঈল নামের এক ব্যক্তির সাথে। ইসমাঈল অত্যন্ত পরহেযগার এবং অনেক বড়ো আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লা-হ)-এর ছাত্র ছিলেন। যে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লা-হ)'র পরিচয় সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যাইহোক, এই ইসমাঈলের স্ত্রীর গর্ভে এক নামীদামী সন্তানের জন্ম হলো যার নাম রাখলেন মুহাম্মাদ। কিন্তু কয়েক বছর পরেই ইসমাঈল তার স্ত্রী এবং শিশু সন্তান রেখে নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আর রেখে যান কিছু ধন-সম্পদ। মা পিতৃহীন এই সন্তানকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে লালন-পালন করতে থাকেন। শিশুর ভবিষ্যতের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য মহান আল্লাহর নিকট সর্বদা দু'আ করতেন। কিন্তু তার সে আশা পূরণে রাখার সৃষ্টি হলো শিশুটি হঠাৎ করেই তার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল। অন্ধ হওয়ার কারণে শিশুটি আলেমদের ক্লাসে আর যেতে সমর্থ হলো না। ফলে মা খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে। কি হবে আমার ছেলের ভবিষ্যত? আমার ছেলে কি দ্বীনের 'ইল্ম অর্জন করতে পারবে না? এ সকল চিন্তায় মা সারাক্ষণ মগ্ন থাকতেন।

অবশেষে তিনি মনে মনে এ আশা পূরণের একটিমাত্র উপায় আছে বলে মনে করলেন। আর সে উপায় হচ্ছে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। সুতরাং তিনি সন্তানের চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহ

[১২০] *আত্ তিরমিযী- ৩৫৪৫; যাওয়ায়েদুল মুসনাদ- হা. ৭৪৪৪, সহীহ।*
[১২১] *সূরা আল আহক্বা-ফ : ১৫।*
[১২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৭১; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪৮।*

রাব্বুল 'আলামীনের নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন। এভাবে করতে করতে হঠাৎ এক রাতে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন : "ইয়া হাজিহি কাদ বাদ্দাল্লাহু 'আলা ইবনাতিকি বাসারাহু বি কাশরাতি দু'আয়িকি।" "হে নারী! তুমি এত বেশি দু'আ করেছ যে, এর ফলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তোমার সন্তানের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" অতঃপর মুহাম্মাদের মা যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তখন তিনি দেখলেন যে, সত্যিই তার সন্তানের দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সন্তানের এ দৃশ্য দেখার সাথে সাথেই তার মুখ থেকে অনিচ্ছায় বের হয়ে আসে–

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ﴾

অর্থ : "হে আমার পরওয়ারদিগার! অতি সমস্যায় জড়িত ব্যক্তির প্রার্থনা তুমি ছাড়া কে শুনতে পারে? আর কে আছে যে, বান্দার সমস্যা দূর করতে পারে।"[১২৩]

এই মহীয়সী নারী যিনি তার সন্তানের জন্য অবিরত প্রার্থনা করেছিলেন, সেই সন্তান মুহাম্মাদ-এর পুরা নাম "আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)"। মা সন্তানের দৃষ্টি ফিরে আসলে তার শিক্ষা-দিক্ষার জন্য এত্ত বেশি শ্রম দেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার ছেলের জন্য সব প্রকার 'ইল্‌মের দরজা খুলে দেন। ফলে তিনি হাদীস শাস্ত্রে বড়ো পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি অর্জন করেন। মহান আল্লাহর কিতাবের পর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব প্রণয়ন করেন যা "সহীহুল বুখারী" নামে প্রসিদ্ধ। সকলেই তাকে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলে জানে। এই হচ্ছে মা। এই মায়ের কি কোনো সমতুল্য হতে পারে? অবশ্যই না।

এবার **মায়ের বদদু'আর ফলে সন্তানের যে করুণ পরিণতি হয় :** নিম্নের হাদীসের মাধ্যমেও স্পষ্ট জানা যায়–

রাসূল (ﷺ) বলেন, বানী ইসরারঈলের মধ্যে জুরাইজ নামে একজন আবিদ ছিলেন। তিনি মাঠের মধ্যে একটি খানকায় মহান আল্লাহর 'ইবাদত-বন্দেগী করতেন। একদিন তার মা এসে বাইরে থেকে ডাকলেন জুরাইজ আমি তোমার মা, তুমি কথা বলো। ঘটনাচক্রে জুরাইজ তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি মনে মনে বললেন, আল্লাহ! এক দিকে "মা", আর একদিকে "সালাত", আমি এখন কি করি? এরপর তিনি সালাতই বেছে নিলেন। মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন না। এভাবে তিন তিনবার তার মা তাকে ডাকলেন এবং তিন তিনবারই সালাতকেই প্রাধান্য দিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তার মা ক্ষোভে, দুঃখে সহ্য করতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহ! আমি জুরাইজকে ডাকলাম অথচ সে আমার ডাকে সাড়া দিলো না, আল্লাহ তা'আলা তুমি তাকে ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু দিও না। রাসূল (ﷺ) বলেন, যদি মা পাপে জড়ানো অথবা এর চেয়ে কোনো কঠিন দু'আ করত তবে তাও কবুল হতো। ঘটনাচক্রে একজন রাখাল জুরাইজের খানকায় থাকত। গ্রামের একজন মহিলাও মাঠে আসত এবং ঐ রাখালের সাথে ব্যভিচার করে গর্ভবতী হলো এবং একটি শিশু প্রসব করলো। গ্রামবাসী তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সে বলে– উক্ত খানকাওয়ালা এর জন্য দায়ি। তখন গ্রামবাসী তার খানকা আক্রমণ করে ভেঙ্গে ফেলে। অবস্থা দেখে জুরাইজ দু'রাকআত সালাত আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে শিশুর কাছে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার পিতা কে? শিশুটি বলে অমুক রাখাল। দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের কথা শুনে গ্রামবাসী জুরাইজের বুজুর্গি বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়।[১২৪]

দেখুন জুরাইজ যদি আলেম হতেন তাহলে বুঝতেন যে, নামায চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া অনেক বেশি জরুরি ছিল। তার ভাগ্য ভালো যে, মা শুধু ব্যভিচারিণীর মুখ দেখার দু'আ করেছিলেন। যদি আরো কঠিন দু'আ করতেন তাহলে হয়ত আর তার বাঁচার উপায় থাকত না।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! শিশু বেলার কিছু স্মৃতি বার বার মনে হচ্ছে। সেই যখন ছোট্ট শিশু ছিলাম সব সময় মায়ের কোলের মধ্যেই থাকতাম। মা যখন দুপুরে অথবা রাতে আমাকে কোলের মধ্যে নিয়ে তার পা দু'টি লম্বা করে দিয়ে এক দিকে কাত হয়ে, বাকা হয়ে অতি কষ্টে ভাত খেতেন। হঠাৎ করে মায়ের কোলের মধ্যে পায়খানা করতাম। মা সেই পায়খানা কোলের মধ্যে রেখেই খেয়েছেন। তার কোনো গন্ধও লাগেনি, ঘৃণাও জন্মায়নি। চুপচাপ সন্তানের পায়খানা কোলের মধ্যে কারোর কোনো সাড়া শব্দ নেই, সেই সময় গভীর রাত্রে মা-ই আমাদের জন্য জেগে দুধ খাওয়াতে মোটেই বিলম্ব করেননি। যদিও এ কাজগুলো এখন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হচ্ছে, কিন্তু মোটামুটি অংকের টাকা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অথচ মার কোনো দিন নির্ধারিত টাকা এবং নির্দিষ্ট সময় বলতে কিছুই ছিল না। দিন এবং রাত সারাক্ষণ সন্তানের সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। এভাবেই তিনি আমাদেরকে বড়ো করে তুলেছেন। তাই এই মায়ের সমতুল্য কি পৃথিবীতে একজনই হতে পারে? মা শুধুমাত্র একজনই মা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক্ব দান করো –আমীন। ❑

[১২৩] *সূরা আন্ নামল : ৬২।*

[১২৪] *বুখারী- ২/৮৭৮, ৪/১২৮৬; সহীহ মুসলিম- ৪/১৯৭৬, ১৯৭৭।*

কবিতা

পেলাম অবশেষে

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘপথ মাড়িয়ে,
কতো কাঠ-খড় পুড়িয়ে
খুঁজেছি সেই অমূল্য সম্পদ
হন্যে হয়ে খুঁজেছি।
পেয়েছি শত পথ শত মত
শুধু বিভেদ আর দলাদলি
পাইনি কোথাও সঠিক পথ!
সময় অর্থ শ্রম সবই হয়েছে পণ্ড
পেয়েছি ছাইভস্ম, দেখেছি সব ভণ্ড।
পীর মাশায়েখ মাজার দরগায়
বিনিদ্র রজনী কেটেছে সেথায়
পাইনি তার খোঁজ!
সবাইকে দিয়ে ফাঁকি, কেঁদেছে আঁখি
দিবা নিশি রোজ-
জীবনে কিছু পাই বা না পাই
যেভাবেই হোক, সে ধন আমার চাই।
এসব অর্থ-কড়ি, বাড়ি গাড়ি–
সবি তুচ্ছ
না পাই যদি কাঙ্ক্ষিত সেই ধন
পুরো পৃথিবী দিয়ে, যাবে না কেনা
অমূল্য সে রতন!
এখানে সেখানে সর্বত্র খুঁজেছি
ঘুরেছি মানুষের দ্বারে দ্বারে
অথচ সেই কাঙ্ক্ষিত ধন
রয়েছে মোর ঘরে!
চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি
অবহেলায় আছে পড়ে!
কেঁদে দিলাম সুখে, তুলে নিলাম বুকে–
পূত-পবিত্র সত্যবাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন
ওহির বাণী দেখালো আমায়, সঠিক পথের সন্ধান-
বুঝে বুঝে পড়ে করলাম অর্জন
পেলাম অবশেষে, কাঙ্ক্ষিত সেই ধন!
সেটা আর কিছু নয়, সেটা হলো বিশুদ্ধ ঈমান।

পর্দা

হাফেয আব্দুর রহমান বিন জামিল

নারী হলো ঘরের শোভা!
গাছের শোভা ফুল!
পর্দা ছাড়া বাইরে যাওয়া!
নারী তোমার ভুল!!
তোমার জন্য পর্দা ফরয!
ইসলাম বলে ভাই!
পর্দা ছাড়া নারী তোমার!
কোনো মূল্য নাই!!
ফল ছাড়া বৃক্ষ যেমন!
পর্দা ছাড়া নারী তেমন!!
চলছে নারী হেলে দুলে
পর্দা বিহীন কেশ!!
দেখছে কত যুবক ছেলে
তারা হচ্ছে শেষ!!
পর্দা বিহীন নারী হলো
মাকাল ফলের মতো!!
মাকাল ফলের ভেতর যেমন
পর্দা বিহীন নারী তেমন!!
বলছি নারী তোমার কথা
শুনো দিয়া মন!!
পর্দা করলে হবে
তুমি অমূল্য রতন!!
নারী হয়ে বুঝতে যদি
পর্দার মর্যাদা!!
কঠিন গরমেও পাই
শীতের শীতলতা!!
পর্দা তোমার দুনিয়াতে
দেবে হাজারো সম্মান!!
আখিরাতে পাবে তুমি
জান্নাতের উচ্চ মাকাম!!
সবাই বলে হিরা নাকি সবচেয়ে দামি
তার চেয়ে দামি হবে পর্দা করলে তুমি!!

জমঈয়ত সংবাদ

খুলনা বিভাগীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খুলনা বিভাগীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মেলন খুলনার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা আল মা'হাদ আস সালাফী ময়দানে গত ৩ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্জ তালুকদার আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিল্পপতি আলহাজ্জ আনোয়ার হোসেন। জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারি শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। জুমু'আর নামায শেষে মেহমানবৃন্দ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. বারকুল্লাহ্ বিন দুররুল হুদা আইউবী প্রমুখ। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, যশোর জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, মেহেরপুর জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, বাগেরহাট জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক সেকেন্দার আলী।

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মাদরাসা আল মাহাদ আস সালাফীর সভাপতি সরদার আব্দুল হামীদ। সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন খুলনা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম এবং মাদরাসার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মইনুল আরেফিন, সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান, সাংগঠনিক সেক্রোটারি মো. মাহবুব মোর্শেদ, জমঈয়ত উপদেষ্টা ডা. আজিজুর রহমানসহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ও মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ মাদ্‌রাসার শিক্ষকবৃন্দ।

রমযানে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম

মাহে রমযানে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক তৎপরতার অংশ হিসেবে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ১ রমযান কালিগঞ্জ উপজেলাধীন সাইটবাড়িয়া, গয়েশ্বরপুর ও একতারপুরের ৬টি মসজিদে উপস্থিত হয়ে জুমুআর খুৎবা প্রদানসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলীল, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক আলী ও অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ ইমরানুর রহমান, সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ আহলে হাদীস জামে মসজিদের খতীব মুহাম্মদ ইসরাইল খান, জেলা জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির সদস্য মাস্টার মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব, জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীসের পক্ষ হতে মুহাম্মদ তাফসির, মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সাইটবাড়িয়া উত্তরপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে 'তাক্বওয়া ও নৈতিক অবক্ষয়রোধে সাওমের অবদান' শীর্ষক বিষয়ক জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান। বাদ জুমু'আহ্ সাইটবাড়িয়া উত্তরপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে অধ্যাপক মুহাম্মদ মুসা করিমের উপস্থাপনায় ও মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফীর কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক সভা শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাইটবাড়িয়া হক্কুলহুদা আলিম মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা রেজাউল্লাহ। সভায় নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও আর্থিক স্বচ্ছলতার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করেন।

যাত্রাবাড়ি মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় চূড়ান্ত হিফয প্রতিযোগিতা

বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহি মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় ২০২৩ সনের চূড়ান্ত হিফয প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ মার্চ মাদরাসা মাসজিদে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঐ প্রতিযোগিতায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী আহলে হাদীস মাদরাসার ১০০ জন হাফিয শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে মুমতায মুরতাফি বিভাগে ২৬জন, মুমতায বিভাগে ৪৫ জন, জাইয়্যিদ জিদ্দান বিভাগে ১৭ জন, জাইয়্যিদ বিভাগে ৬ জন ও মাকবুল বিভাগে ১ জন উত্তীর্ণ। প্রথম স্থান অধিকার করে মাদ্‌রাসাতুল হাদীস নাজির বাজারের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ মুত্তাসির। *[২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***নিকটবর্তী প্রতিবেশি যদি বিদআতি হন, তাহলে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-পতিল ইত্যাদি আদান-প্রদান করলে কোনো গুনাহ হবে কী?***

আয়েশা খাতুন
পাঠানটোলা, সিলেট।

জবাব : নিকটতম প্রতিবেশি যদি নিজে বিদআত বা কুফ্রী করেন কিন্তু তিনি আপনাকে সুন্নাহ মোতাবেক চলতে বাধা দেন না, তাহলে এমন প্রতিবেশিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করাতে কোনো দোষ হবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।" *(সূরা আল মুমতাহিনাহ : ৮)*

তবে কোনো অবস্থাতে প্রতিবেশির বিদআত, কুফ্রী বা যে কোনো প্রকারের অন্যায়কে কোনোভাবে সমর্থন করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾

"আর পাপ ও সীমলঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না...।" *(সূরা আল মায়িদাহ : ০২)*

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আপনার প্রতিবেশি চাইলে তাকে দেবেন এবং এ সুযোগে তাকে বিদআত বর্জনের উপদেশ করবেন। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমি একজন নার্স। হাসপাতালে ডিউটি করার সময় ইঞ্জেকশন দেওয়া বা সুগার দেখার ক্ষেত্রে পর-পুরুষের হাত ধরতে হয়। এতে কী আমি গুনাহগার হব?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ওসমানী নগর, সিলেট।

জবাব : মূলত বেগানা পুরুষের সাথে মিলে কাজকর্ম করা মহিলাদের জন্য হারাম। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেগানা পুরুষের রক্ত নেওয়া বা ইঞ্জেকশন দেওয়ার কোনো বিকল্প পুরুষ না থাকলে এবং বিষয়টি তৎক্ষণাৎ আবশ্যক হয়ে পড়লে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে কাজ করা দোষের হবে না। যেখানে পুরুষের অবাধে আনাগোনা থাকে, এমন জায়গায় মুসলিম নারীর কাজ করা উচিত নয়। আপনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, আপনার পর্দা রক্ষা হবে এরূপ কর্মক্ষেত্র তালাশ করুন! আল্লাহ আপনার সহায় হবেন এবং উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের সুব্যবস্থা করে দেবেন। বিকল্প রুজির ব্যবস্থা না থাকলে এবং আপনি একান্ত নিরুপায় হলে সর্বাবস্থায় বান্দা মহান আল্লাহকে ভয় করে চলবেন ও সতর্কতা অবলম্বন করে সেবিকার কাজ করবেন। সাথে সাথে মহিলাদের জন্য পৃথক হাসপাতাল থাকলে সেগুলোতে চাকরির চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। আশা করি, নিরুপায় হয়ে এরূপ কাজের জন্য আপনি গুনাহগার হবেন না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***কুরআন-হাদীস দ্বারা সকাল-সন্ধ্যার দু'আ ও যিক্র-এর কথা জেনেছি। এটি কি সূর্য উঠার বা অস্ত যাওয়ার আগে না পরে পড়তে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

ফরহাদ শেখ
পশ্চিম দিনাজপুর, ভারত।

জবাব : সকালের যিক্রগুলো ফজরের পর সূর্য ওঠার আগে করতে হবে এবং বিকালের যিক্রগুলো 'আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾

"আর প্রশংসার সাথে তোমার রবের তাসবীহ পাঠ করো সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য ডোবার আগে।" *(সূরা ক্বা-ফ : ৩৯)*

কাজেই উপরোক্ত নির্ধারিত সময়ে সকাল-সন্ধ্যার যিক্র করাই উত্তম। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***একজন বয়স্ক ব্যক্তি ব্রেইন স্ট্রোক করে দেহের একাংশ অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় আছেন। এক্ষণে তিনি কীভাবে সালাত আদায় করবেন?***

আবু নু'আইম
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

জবাব : ব্রেইন স্ট্রোকের কারণে কোনো ব্যক্তির দেহের একাংশ অবসাদগ্রস্ত হলে তিনি অসুস্থ ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন। তিনি নিজে ওযূ করতে না পারলে পরিবারের কোনো সদস্য তাকে ওযূ করতে সহায়তা করবেন। অপরের সহায়তায় ওযূ করে তিনি সালাত আদায় করবেন। ওযূ করার জন্য কোনো সহায়তাকারী না পেলে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অবশেষে কোনো সাহায্যকারী না পেলে এবং ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবেন। অনুরূপ পানি ব্যবহারে ক্ষতির ভয় থাকলেও তায়াম্মুম করে সালাত পড়বেন। যদি কোনো সাহায্যকারী না পান, তাহলে ওয়াক্তের মধ্যেই ওযূ বা তায়াম্মুম ছাড়াই সালাতের নিয়ত করে ইশারা করত সালাত সম্পন্ন করবেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"অতএব তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো!"– *(সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৬)*। ইন্শা-আল্লাহ তার সালাত কবুল হবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : বৃহস্পতিবার রাতে ইমাম সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে ক্বিয়াম করেন এবং "ইল্লাল্লাহ" যিক্র করেন। এক্ষণে এ ধরনের ইমামের পেছনে সালাত আদায় সঠিক হবে কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

জবাব : ক্বিয়াম দ্বারা যদি তথাকথিত মীলাদের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত হয়েছেন-এ বিশ্বাস করে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে বুঝায়, তাহলে এটি শির্কী কাজ। আর যিনি এরূপ শির্কী 'আক্বীদাহ্ পোষণ করেন, তার পেছনে ইক্তেদা করে সালাত আদায় করা জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে 'ইল্লাল্লাহ' এটি একটি বাক্যের একাংশ। যে বাক্যের দু'টি অংশ একত্রে না হলে বাক্য হয় না এবং অর্থও করা যায় না; বরং একাংশের অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলা নেই। কাজেই এরূপ যিক্রকারীগণও শির্ক থেকে মুক্ত নয়। অতএব জেনে-বুঝে এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে সালাত সহীহ হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমার মা প্যারালাইজড। উনি নিজে ওযূ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করলে হবে কী?

মো. যোবাইর

কেশবপুর, যশোর।

জবাব : আপনার আম্মা প্যারালাইজড। তিনি নিজে ওযূ করতে না পারলে আপনারা তাকে ওযূ করতে সহায়তা করবেন, যদি তার জন্য পানি ব্যবহার কোনো ক্ষতির কারণ না হয়। আর তিনি পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে পারবেন। *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ০৬)*

জিজ্ঞাসা (০৭) : নিছক বিনোদন কিংবা সময় ক্ষেপণ করার উদ্দেশ্যে খেলা দেখা জায়িয হবে কী? আশাকরি উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন।

কায়সার

বিরল, দিনাজপুর।

জবাব : মানুষের জন্য প্রতিটি মুহূর্তই মহান আল্লাহর বড়ো নিয়ামত। তাঁর কাছে এ সময়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। যে সব খেলায় শরঈ শর্ত মেনে শারীরিক কসরত হয় এবং সালাতে কোনোপ্রকার বিঘ্নতা সৃষ্টি করে না, তা (খেলা) জায়িয। পক্ষান্তরে নিছক বিনোদনের জন্য বা সময় ক্ষেপণের জন্য খেলাধুলা করা জায়িয নয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এমন করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরা আল মুনা-ফিকূন : ০৯)*

শরিয়ত বাধা দেয় না এমন খেলাধুলায় সময় নষ্ট করাকেও ওলামাগণ অপছন্দ করেছেন– *('আল-মুয়াফাক্বাত'- ইমাম শাত্বেবী, ১/২০৪ ও ২০৫)*। কাজেই সময় ক্ষেপণের জন্য অনর্থক খেল-তামাশায় মগ্ন হওয়া তাক্বওয়ার পরিপন্থি। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ইত্তেবা'আ কী? কার ইত্তেবা'আ করবো –কুরআন-হাদীস থেকে জবাব দেবেন।

মুহাম্মাদ সুফিয়ান

ঝিকরগাছা, যশোর।

জবাব : ইত্তেবা'আ অর্থ অনুসরণ করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহান আল্লাহর তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন আদেশ-নিষেধ রূপে, তার অনুসরণ করাই হলো 'ইত্তেবা'আ'। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

"তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তারই ইত্তেবা'আ করো। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবকগণের অনুসরণ করো না।" *(সূরা আল আ'রাফ : ০৩)*

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَآمِنُوْا بِاللهِ

وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

"বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। (সেই আল্লাহর) যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন। কাজেই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তার প্রেরিত উম্মী রাসূলের প্রতি– যে নিজে আল্লাহর প্রতি ও তার যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে, তোমরা তার অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো।" *(সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮)*

কুরআন ও সহীহ হাদীসে এরূপ বহু দলিল বিদ্যমান, যা প্রমাণ করে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে; অন্য করো নয়। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***ওয়াসিলা কী? কোনো ব্যক্তি বিশেষত আলেম-উলামা বা ওলী-আউলিয়ার ওয়াসিলায় দু'আ করা যাবে কী?***

হাসান যাবের
সোবহানীঘাট, সিলেট।

জবাব : ওয়াসীলা অর্থ মাধ্যম। দু'আর ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) প্রকার ওয়াসীলা জায়িয। **এক.** মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলায় দু'আ করা। এটি সর্বোত্ত ওয়াসীলা। **দুই.** নিজ নেক 'আমলের ওয়াসীলায় দু'আ করা। অর্থাৎ- এভাবে দু'আ চাওয়া যে, হে আল্লাহ! অমুক 'আমলটি কেবলমাত্র তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছি। কাজেই এর ওয়াসীলায় আমার দু'আটি কবুল করো! **তিন.** উপস্থিত কোনো ভালো মানুষের দু'আর ওয়াসীলায় আবেদন করা। যেমন- 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র খিলাফতকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি বললেন– হে আল্লাহ! যতদিন তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর ওয়াসীলায় দু'আ চেয়েছি। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাই তাঁর চাচা বয়স্ক সাহাবী 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ওয়াসীলায় দু'আ চাচ্ছি। এ বলে তিনি সাহাবী 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে দু'আ করার জন্য আহ্বান করেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭১০)*। এভাবে জীবিত উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে দু'আ করতে বলাই হলো সৎ মানুষের ওয়াসীলায় দু'আ চাওয়া। পক্ষান্তরে মৃত বা দূরে অবস্থানকারী অনুপস্থিত ব্যক্তির ওয়াসীলায় দু'আ চাওয়া মানে ঐ লোকের বিশেষ ক্ষমতা আছে বলে মনে করা। আর এ বিশ্বাস শির্‌কী হওয়ায় এরূপ ওয়াসীলা গ্রহণ করা জায়িয নয়– *('আত্ তাওয়াস্সুল'- আল-বানী, ৫০-৬৮ পৃ.)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***আমি কিছু টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করেছিলাম। তখন আমাকে কিছু ঋণ করতে হয়েছিল। বর্তমানে আমি ঐ জমি বিক্রি করে মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। এখন কীভাবে তা দান করলে সঠিক হবে?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাড্ডা, ঢাকা।

জবাব : জমি বিক্রয় করার পর প্রথমে আপনার পূর্বের ঋণ পরিশোধ করবেন। অতঃপর বাকি টাকা মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন। সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

"তোমাদের কৃত ওসীয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধ করার পর...।" *(সূরা আন্ নিসা : ১২)*

কাজেই জমি ক্রয় করার সময় যে ঋণ করেছিলেন, জমি বিক্রি করে প্রথমে তা পরিশোধ করবেন। তার পর যা থাকবে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***আমি আমার ভাই দ্বারা কষ্ট পেয়েছি। আমি চাই সে কষ্টের কথা আমার ভাইকে জানাই, যাতে সে বুঝতে পারে– সে জুলুমকারী। এখন আমি মেয়ে মানুষ। তাই আমার ভাইকে কীভাবে তার অন্যায় জুলুমের কথা বলবো? উল্লেখ্য যে, আমার ভাই আমি তার ঘরে যাই, তা সে পছন্দ করে না।***

জনৈকা মহান আল্লাহর বান্দী
উপশহর, সিলেট।

জবাব : আপনার ভাই দ্বারা যে কষ্ট আপনি পেয়েছেন, তা তার কাছে খুলে বলুন। হতে পারে তাতে সে তার ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন হয়ে যাবে এবং আপনার বুকের চাপা ব্যথা দূর হবে। কারো ভুল ধরে দেওয়া দোষের কিছু নয়; বরং এতে কল্যাণ নিহিত আছে। অগত্যা আপনার ভাই নিজের ভুল না বুঝে যদি আপনার প্রতি আরো রাগান্বিত হয়, তাতে আপনার কোনো অন্যায় হবে না। উপরন্তু আপনার ভাই আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার দায়ে দায়ি হবে। আর এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾

"ক্ষমতা পেলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির করেন আর তাদের দৃষ্টি শক্তিকে করেন অন্ধ।" *(সূরা মুহাম্মাদ : ২২-২৩)*

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৪)*

অতএব, আপনি আপনার পক্ষ থেকে সু-সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, 'ইশার পর সালাতুল বিত্র শেষ করে বসে বসে ২ রাকআত সালাত আদায় করা হয়। এটিকে হালকা নফল সালাত বলে। কুরআন-সুন্নাহ হতে এর সত্যতা জানতে চাই।***

রায়হান উদ্দিন
কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আট রাকআত ক্বিয়ামুল লাইল পড়ে তিন রাকআত বিত্র পড়তেন। অতঃপর কখনো বসে দু'রাকআত নফল পড়তেন। এটি তাঁর (ﷺ) নিয়মিত 'আমল ছিল না। ভাষ্যকারদের মতে, বিত্র পড়ার পর কেউ চাইলে আরো নফল পড়তে পারে কিংবা নফল সালাত বসে বসে পড়া জায়িয-এ কথা বুঝাবার জন্য রাসূল (ﷺ) এমনটি করতেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يصلِّي ركعتينِ بعد الوِترِ وهو جالسٌ.

"রাসূল (ﷺ) বিত্র পড়ার পর বসে দু'রাকআত সালাত পড়তেন।" *(আল-ফাইরুজাবাদী 'সফরুস্ সা'আদাহ'- বর্ণনাকারী : আবূ উমামাহ্ আল-বাহেলী, হা. ৭৭, বর্ণনাকারী সহীহ)*

অতএব, এ হাদীস দ্বারা মুহাদ্দীসগণ 'হালকা নফল' নামে দু'রাকআত পড়তে হবে মর্মে কোনো অভিমত দেননি। কাজেই এটিকে নিয়মিত 'আমল বানানো ঠিক হবে না। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***ঘরে বিড়াল পালা যাবে কী? এ বিষয়ে দলিলভিত্তিক জবাব জানতে চাই।***

খালেদ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

জবাব : ঘরে বিড়াল পালা দোষের কিছু নয়; বরং জায়িয। তাকে স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে ও খেতে দিতে হবে। এ মর্মে হাদীসে এসেছে–

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات.

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন : "এটি নাপাক নয়। এটিতো তোমাদের চতুরপার্শ্বে ঘুরে বেড়ায়।" *('আত্ তালখীস'- ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, ১/১৫, সহীহ)*

খেতে না দিলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২২৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৫০৭)*

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত ঘরে পড়ে যাওয়ার পর মসজিদে গিয়ে দেখি জামা'আত শুরুর এখনো সময় বাকি। এমতাবস্থায় ২ রাকআত পড়ে বসবো, না এমনি বসে যাবো?***

আব্দুল মাজিদ
সুপারিবাগান, টাংগাইল।

জবাব : মসজিদের প্রথম কাজ হবে সালাত দ্বারা শুরু করা। ঘরে ফজরের সুন্নাত পড়ে মসজিদে এমন সময় আসতে হবে, যাতে সরাসরি জামা'আতে শরীক হওয়া যায়। তবে কখনো যদি এমন হয় যে, আপনি জামা'আত ক্বায়েমের সময় জানতে পারেননি। মসজিদে এসে দেখেন এখনো জামা'আত শুরু হতে দেরি আছে, তাহলে (এরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে) ২ রাকআত সালাত আদায় করে বসবেন। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার আগে দু'রাকআত পড়ে নেয়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৬৭, মা. শা., ২/৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭১৪)*

তবে এমন কাজ নিয়মিত করা ঠিক না। কেননা, রাসূল (ﷺ) ফজরের আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে ২ রাকআতের বেশি কখনো পড়েননি। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***ওযূ করার সময় আমার সন্দেহ– আমি হাত ধুলাম কি না? বা মাথা মাসেহ করলাম কি না? এমন অবস্থা হলে আমি কী করবো?***

উম্মে হাবিবাহ
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : ওযূর সময় এরূপ সন্দেহ বেশি বেশি হলে এটিকে সূচিবায়ু বা সন্দেহ বাতিক রোগ বলে। কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিলে আশাকরি তা দূর হয়ে যাবে। মনে রাখবেন– এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন, তাকে তোমরা শত্রু হিসেবে গণ্য করো!" *(সূরা ফা-ত্বির : ০৬)*

অতএব, দৃঢ়চিত্ত হোন, সন্দেহ মুক্ত থাকুন। জেনে রাখবেন– এরূপ সন্দেহ আপনার ওযূতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***আল-কুরআনে যাকাত প্রদানের যে, ৮টি খাত বলা হয়েছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে ফক্বীর ও মিসকীন। আমার প্রশ্ন– ফক্বীর ও মিসকীন কাকে বলে? এ দু'য়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।***

আবু ফায়সাল
রিয়াদ, সৌদি আরব।

জবাব : যাকাত প্রদানের নির্ধারিত ৮টি খাতের মধ্যে ফক্বীর ও মিসকীন দু'টি খাত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে সহজেই অনুমেয় যে, খাত দু'টির মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ফক্বীর ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দু'এক বেলার খাবারও জুটে না। আর মিসকীন বলা হয়– যার কিছু আছে, তবে তা দিয়ে তার প্রয়োজন মেটে না। *(সূরা আল হাশ্র : ৮; সূরা আল কাহ্ফ : ৭৯)*

রাসূল (ﷺ) মিসকিনী জীবন কামনা করলেও ফক্বিরী জীবন হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৭১৩; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৪৪, সহীহ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৮১ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৪৩১)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***আমাদের সমাজের মহিলারা নিজ ঘরে ই'তিকাফ করেন। আমার প্রশ্ন– মসজিদ ছাড়া বাড়িতে ই'তিকাফ করা জায়িয হবে কি? এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কিছুটা বিতর্ক চলছে। দয়া করে দলিলভিত্তিক জবাব দেবেন।***

ফুরকান উদ্দিন
জলঢাকা, নীলফামারী।

জবাব : ই'তিকাফ মসজিদেই করতে হয়। বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ করলে তা সঠিক হবে না; বরং এটিকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বৈরাগ্যতা বলা হবে। আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফকে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫ ও ১৮৭)*। কেননা, ই'তিকাফের পারিভাষিক অর্থই হচ্ছে– মহান আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য মসজিদে অবস্থান করা– *(আশ্ শারহুল মুমতি'আ- ৬/৪৯৯)*। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন। এ কারণে সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়িতে ই'তিকাফ করাকে বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছেন– *(বায়হাক্বী- ৪/৩১৬)*। কাজেই ক্বিয়াসভিত্তিক ফাতাওয়ার আলোকে কারো বাড়ি-ঘরে ই'তিকাফ জায়িয হবে না।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***যাকাতুল ফিত্র যাকে আমরা ফিতরা বলি, তা ফর্য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক কি? আমাদের সমাজের 'আলিমগণ বলেন– ফিতরার জন্যও নিসাব প্রয়োজন। তা না হলে ফিতরা ফর্য হবে না। এ ব্যাপারে আপনাদের নিকট থেকে সঠিক উত্তর পাব বলে একান্ত আশাবাদী।***

মো. ফুয়াদ আল-আমীন
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

জবাব : যাকাতুল ফিত্র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিতরা ফর্য হওয়ার জন্য কোনো নিসাব নির্ধারণ করেননি। তিনি (ﷺ) মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর যাকাতুল ফিত্র ফর্য করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮০৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬১১; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৬৭৫, সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫০০ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪২৫)*। এখানে নিসাবের কোনো কথা উল্লেখ নেই। কাজেই যারা নিসাবের কথা বলবে, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপ করবে– যা সঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (১৯) : ***যাকাতুল ফিত্র আদায় করার নিয়ম কি? কোনো কারণবশতঃ ঈদের পর আদায় করলে চলবে কি? আমি একটি হাদীসে পড়েছি– ঈদের পর যাকাতুল ফিত্র আদায় করলে না-কি সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হয়। আসলে এ কথার সত্যতা কতখানি? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

মো. সোহেল রানা
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : ঈদের দিন ফজরের পর হতে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিত্র আদায় করতে হয়– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬০৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৮২৭)*। ঈদের পর আদায় করা সুন্নাত বিরোধী। আর সুন্নাত বিরোধী কাজ কেউ করলে সে গুনাহগার হবে। তাই বলে আদায় না করে কোনো উপায় নেই। ফিতরা প্রদান করতে হবে এবং বিলম্বের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করতে হবে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো ব্যক্তি ঈদের দু'এক দিন আগে তা আদায় করে দিতে পারে। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর 'আমল দ্বারা তা প্রমাণিত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫১১ ও সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ২৩৯৭)*। আর আপনার জিজ্ঞাসা মতে, ঈদের পর যাকাতুল ফিত্র আদায় করলে তা সাধারণ সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হবে মর্মে বর্ণিত হাদীসখানা সহীহ, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ- শরিয়ত নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার কারণে সাওয়াবের দিক থেকে কিছুটা কম বলে বিবেচিত হবে।

জিজ্ঞাসা (২০) : ***আমি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে ই'তিকাফ করতে চাই। শুনেছি ২১ রামাযান ফজরের পর ই'তিকাফে বসতে হয়। আবার কেউ কেউ বলেন ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পর প্রবেশ করতে হয়। আসলে কোন্‌টি ঠিক? দলিলসহ উত্তর দিয়ে ধন্য করবেন।***

মো. লুৎফুর রহমান
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ২১ রামাযানের ফজর সালাত আদায় করে ই'তিকাফের নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন– *(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৭৩; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৬৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৯১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৭০৯ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭৭১)*। আপনি ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পর মসজিদে প্রবেশ করে 'ইবাদত-বন্দেগী করবেন এবং রাত শেষে ফজরের সালাত আদায় করে ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত পর্দাবৃত্ত স্থানে প্রবেশ করবেন। এটি বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আর হাদীসের বর্ণনা তা-ই বুঝায়। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

মহানবী (ﷺ) নির্মিত প্রথম মসজিদ
মসজিদে কুবা

–আহমাদ রফিক*

মসজিদে কুবা। ইসলামের ইতিহাসে সহস্রবার উচ্চারিত নাম। মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসার পর নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ। যার নির্মাণকাজে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ)। পবিত্র কুরআনে এই মসজিদকে বলা হয়েছে 'তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ'। এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাপনার কাঠামো নির্মাণ। রচিত হয় মানবেতিহাসের সর্বোত্তম সংবিধান। এই মসজিদ তাই ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ইতিহাস : ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। এর উপর ভিত্তি করেই শুরু হয় হিজরি সাল গণনা। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (ﷺ) সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। বনু 'আম্র ইবনু আওফ গোত্রের নেতা কুলসুম বিনতু হাদম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মালিকানাধীন জমি নির্বাচিত হলো এই মসজিদ নির্মাণের জন্য। জমিটি ইতোপূর্বে খেজুর শুকানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। জমি নির্বাচনের পর শুরু হয় মসজিদের নির্মাণকাজ। নির্মাণকাজে অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহানবী (ﷺ) নিজেও অংশগ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মসজিদের অবয়ব। তৈরি হয় খুঁটি, দেয়াল, ছাদ। নির্মিত হয় মসজিদে কুবা।

নামকরণ : কুবা একটি কূপের নাম। প্রাচীনকাল থেকেই কুবা পিপাসা মেটাচ্ছে মানুষের। কুবাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যেই গ্রাম, সময়ের পরিক্রমায় তার নামও হয় কুবা। আর এই গ্রামেই নির্মিত হওয়ায় এই মসজিদের নাম হয় মসজিদে কুবা।

অবস্থান : মসজিদে কুবার অবস্থান মদীনার উপকণ্ঠে। মদীনার মূল শহর তথা মসজিদে নববী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে এবং মক্কা থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে মদীনায় অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানায় মসজিদে কুবা।

পবিত্র কুরআনে মসজিদে কুবার উল্লেখ : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মসজিদে কুবা ও কুবা গ্রামের অধিবাসীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

"যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে অবস্থান করা আপনার জন্য অধিক সঙ্গত। সেখানে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্র ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।"[১২৫]

হাদীসে মসজিদে কুবার উল্লেখ : মসজিদে কুবার ব্যাপারে অনেক হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে নয়টি হাদীস, সহীহ মুসলিমে তেরোটি, সুনান আবূ দাউদে দু'টি এবং মুয়াত্তা মালেক ইবনু আনাসে ছয়টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– "মসজিদে কুবায় এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, সওয়াবের দিক থেকে একটি 'উমরাহ্ করার সমতুল্য।"[১২৬]

হিজরতের পর মহানবী (ﷺ) তার জীবনের দশটি বছর কাটিয়েছেন মদীনায়। এ সময়ে তিনি পায়ে হেঁটে অথবা উট কিংবা ঘোড়ায় আরোহণ করে কুবা মসজিদে যেতেন। এরপর তিনি সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন।

অন্য হাদীসে আছে– প্রতি শনিবারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুবায় আগমন করতেন।[১২৭]

হাদীসের এমন বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে নবীর যুগ থেকেই মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের জন্য গমন করা মদিনাবাসীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এখনও তাদের এই 'আমল অব্যাহত রয়েছে। মহানবী (ﷺ)-এর অনুসরণে কুবা মসজিদে আসা ও দু'রাকআত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। মক্কায় হজ্জপালন শেষে মদিনায় অবস্থানরত হাজীগণ মসজিদে কুবায় গিয়ে সালাত আদায় করেন।

---

* *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, ঢাকা।*

[১২৫] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৮।*
[১২৬] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[১২৭] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

মসজিদে কুবার সংস্কার কাজ : মসজিদে কুবা শুরু থেকে এ পর্যন্ত কয়েক দফা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হয়। মহানবী (ﷺ)-এর আমলের পর ইসলামের তৃতীয় খলিফা 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার খেলাফতকালে মসজিদে কুবার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে আরও বেশ কয়েকবার এই মসজিদের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। 'উমার ইবনু 'আব্দুল আযীয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ও তার ছেলে প্রথম 'আব্দুল মাজিদ প্রমুখ শাসকরা মসজিদে কুবার সংস্কার কাজ করেন। ৪৩৫ হিজরিতে আবূ ইয়ালি আল-হোসায়নি মসজিদে কুবা সংস্কার করেন। তিনি মসজিদের মিহরাব তৈরি করেন। ৫৫৫ হিজরিতে কামাল আল-দিন আল-ইসফাহানি মসজিদে আরও বেশ কিছু সংবর্ধনের কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে ৬৭১, ৭৩৩, ৮৪০ ও ৮৮১ হিজরিতে 'উসমানি খেলাফতকালে মসজিদটি সংস্কার করা হয়। 'উসমানি শাসনামলে ১২৪৫ হিজরিতে সর্বশেষ সংস্কার করেন সুলতান 'আব্দুল মজিদ। ১৯৮৬ সালে বাদশাহ ফাহাদ বিন 'আব্দুল 'আযীয আলে সৌদের সময় সর্বশেষ সম্প্রসারণ করা হয়। তখন পুরো মসজিদে এক ধরনের উন্নতমানের সাদাপাথর ব্যবহার করা হয়, যা অন্যকোনো মসজিদে সাধারণত দেখা যায় না।

মসজিদে কুবার বর্তমান অবকাঠামো : মসজিদে কুবার বর্তমান আয়তন ১৩ হাজার ৫০০ স্কয়ার মিটার। চারটি উঁচু মিনার, ছাদে ১টি বড়ো গম্বুজ এবং ৫টি অপেক্ষাকৃত ছোটো গম্বুজ রয়েছে। এছাড়া ছাদের অন্য অংশে ৫৬টি ছোট গম্বুজের অবয়ব রয়েছে। ২০ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে সালাত আদায় করতে পারে এই মসজিদে।

মূল মসজিদ ছাড়াও এখানে রয়েছে আবাসিক এলাকা, অফিস, ওযূখানা, দোকান ও লাইব্রেরি। তবে মসজিদের মূল আকর্ষণ বিশাল গম্বুজ এবং চার কোনায় চারটি সুউচ্চ মিনার। মসজিদের চতুর্দিকের সুবজ পাম গাছের বলয় মসজিদটিকে বাড়তি সৌন্দর্য দিয়েছে। মসজিদটি দেখতে প্রতিদিন প্রচুর জনসমাগম ঘটে। মসজিদে নারী ও পুরুষদের সালাতের জায়গা ও প্রবেশপথ আলাদা। ওযূর জায়গাও ভিন্ন। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। মসজিদের ভেতরের কারুকাজও বেশ মনোমুগ্ধকর।

মূল মসজিদ ভবনের মাঝে একটি খালি জায়গা আছে, সেখানেও সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। দামি কারপেট বিছানো মেঝেতে মুসল্লিরা সালাত আদায় করেন। এছাড়াও রয়েছে যম্‌যম্ পানির ব্যবস্থা।

মসজিদের উত্তর দিক নারীদের জন্য সংরক্ষিত। ১১২ বর্গমিটার অংশজুড়ে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের থাকার জায়গা, একটি লাইব্রেরি, প্রহরীদের থাকার জায়গা এবং সাড়ে ৪শ' বর্গমিটার স্থানে ১২টি দোকানসমৃদ্ধ একটি বাণিজ্যিক এলাকা। মসজিদে ৭টি মূল প্রবেশদ্বার ও ১২টি সম্পূরক প্রবেশ পথ রয়েছে। ১০ লাখ ৮০ হাজার থার্মাল ইউনিট বিশিষ্ট তিনটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র মসজিদকে ঠান্ডা রাখছে।

মসজিদের বহির্ভাগে এ মসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণীগুলো সুন্দরভাবে লিখে রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিক কুবা মসজিদ শ্বেতবর্ণের একটি অনন্য স্থাপত্যকর্ম হওয়ার দরুন বহু দূর থেকে এর স্থাপনা দৃষ্টিগোচর হয়। ❑

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস উলামায়ে কিরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান!** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
রামাযান-১৪৪৪ হি./২০২৩ ইং সালের
সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী
(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	২৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
০২	২৫ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
০৩	২৬ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
০৪	২৭ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১৩
০৫	২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১৩
০৬	২৯ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
০৭	৩০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৪
০৮	৩১ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
০৯	০১ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
১০	০২ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৫
১১	০৩ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
১২	০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৬
১৩	০৫ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৬
১৪	০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৭
১৫	০৭ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৭
১৬	০৮ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৮
১৭	০৯ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৮
১৮	১০ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৯
১৯	১১ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৯
২০	১২ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯
২১	১৩ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২২	০৬ : ২০
২২	১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২০	০৬ : ২০
২৩	১৫ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১৯	০৬ : ২০
২৪	১৬ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ১৮	০৬ : ২১
২৫	১৭ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ১৭	০৬ : ২১
২৬	১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ১৬	০৬ : ২২
২৭	১৯ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ১৫	০৬ : ২২
২৮	২০ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ১৪	০৬ : ২২
২৯	২১ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ১৩	০৬ : ২৩
৩০	২২ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১২	০৬ : ২৩

{আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ইসলামিক ফাইন্ডার (ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী) এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত}

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য

ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ০০ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ৪৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ০০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৬ মি. ৪৮ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৭ মি. ৩০ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ১৮ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৭ মি. ৩৬ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৩৬ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০২ মি. ৩৬ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৬ মি. ১৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ১২ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ০৬ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৪৮ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৩০ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৩ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ২৩ মার্চ-২০২৩ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৩ ইং অনুযায়ী সালাতের সময়সূচি

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৪:৩০	০৫:৫০	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:১৫	০৭:৪৫
০২	০৪:২৯	০৫:৪৯	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:১৫	০৭:৪৫
০৩	০৪:২৮	০৫:৪৮	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:১৬	০৭:৪৬
০৪	০৪:২৭	০৫:৪৭	১২:০২	০৩:২৯	০৬:১৬	০৭:৪৬
০৫	০৪:২৬	০৫:৪৬	১২:০২	০৩:২৯	০৬:১৭	০৭:৪৭
০৬	০৪:২৫	০৫:৪৫	১২:০২	০৩:২৮	০৬:১৭	০৭:৪৭
০৭	০৪:২৪	০৫:৪৫	১২:০২	০৩:২৮	০৬:১৭	০৭:৪৭
০৮	০৪:২৩	০৫:৪৪	১২:০১	০৩:২৮	০৬:১৮	০৭:৪৮
০৯	০৪:২২	০৫:৪৩	১২:০১	০৩:২৮	০৬:১৮	০৭:৪৮
১০	০৪:২১	০৫:৪২	১২:০১	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৪৯
১১	০৪:২০	০৫:৪১	১২:০০	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৪৯
১২	০৪:১৮	০৫:৪০	১২:০০	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৪৯
১৩	০৪:১৭	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৫০
১৪	০৪:১৬	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৬	০৬:২০	০৭:৫০
১৫	০৪:১৫	০৫:৩৭	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:২১	০৭:৫১
১৬	০৪:১৪	০৫:৩৬	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:২১	০৭:৫১
১৭	০৪:১৩	০৫:৩৫	১১:৫৯	০৩:২৫	০৬:২১	০৭:৫১
১৮	০৪:১২	০৫:৩৪	১১:৫৯	০৩:২৫	০৬:২২	০৭:৫২
১৯	০৪:১১	০৫:৩৪	১১:৫৯	০৩:২৫	০৬:২২	০৭:৫২
২০	০৪:১০	০৫:৩৩	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:২৩	০৭:৫৩
২১	০৪:০৯	০৫:৩২	১১:৫৮	০৩:২৪	০৬:২৩	০৭:৫৩
২২	০৪:০৮	০৫:৩১	১১:৫৮	০৩:২৪	০৬:২৪	০৭:৫৪
২৩	০৪:০৭	০৫:৩০	১১:৫৮	০৩:২৪	০৬:২৪	০৭:৫৪
২৪	০৪:০৬	০৫:২৯	১১:৫৮	০৩:২৩	০৬:২৪	০৭:৫৪
২৫	০৪:০৫	০৫:২৯	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:২৫	০৭:৫৫
২৬	০৪:০৪	০৫:২৮	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:২৫	০৭:৫৫
২৭	০৪:০৩	০৫:২৭	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:২৬	০৭:৫৬
২৮	০৪:০২	০৫:২৬	১১:৫৭	০৩:২২	০৬:২৬	০৭:৫৬
২৯	০৪:০১	০৫:২৬	১১:৫৭	০৩:২২	০৬:২৭	০৭:৫৭
৩০	০৪:০০	০৫:২৫	১১:৫৭	০৩:২২	০৬:২৭	০৭:৫৭

রামাযানুল মুবারক

১৪৪৪ হিজরী ২০২৩ ঈসায়ী

আমাদের আহ্বান

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জনের মাস রামাযানুল মুবারক। 'আমলে সালেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদরাসা'র** শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি**-র ভবনের কাজও সম্পন্ন হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে বলে আমরা আশাবাদী- ইনশা-আল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে আলহাজ্জ এ কে এম রহমত উল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য ও সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** ও **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'**-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রামাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-		
"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	**বিকাশ পার্সোনাল:** ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

আরফাওয়ার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ☎ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith